ব্যবসায় উদ্যোগ

নবম-দশম শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯K †evW KZK 1996 wk¶vel
†_‡K beg-`kg †kYxi cvV¨c¯Ki‡c wbawiZ

e¨emvq D‡`¨vM

beg-`kg †kYx

iPbv

W. GBP Gg nweei ingvb

wbjdvi Avn‡g`

m¤úv`bv

Rvgvj DwÏb Avn‡g`

RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯K †evW, XvKv

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিমিটেড

প্রচ্ছদ
সেলিম আহ্‌মেদ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে : অঙ্কুর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওয়েব বিন্যাস)

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক–শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যেকোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

মাধ্যমিক স্তরে 'ব্যবসায় উদ্যোগ' বিষয়টি একটি ঐচ্ছিক বিষয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবসায় উদ্যোগ সম্পর্কিত শিক্ষা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। এ কথা বিবেচনায় রেখে ব্যবসায়শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমে ব্যবসায় উদ্যোগকে একটি নতুন বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায়, তরুণ শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে শিক্ষাজীবন শেষে চাকরির ওপর নির্ভরশীল না হয়েও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে। ফলে শিক্ষিত বেকারদের জন্য একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, অন্যদিকে তেমনি দেশে ক্ষদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং বিভিন্ন শিল্প স্থাপন এবং বিভিন্ন শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	আত্মকর্মসংস্থান	১০
তৃতীয় অধ্যায়	ব্যবসায় প্রকল্প নির্বাচন	১৬
চতুর্থ অধ্যায়	সহায়তার ধরন ও উৎসসমূহ	২৩
পঞ্চম অধ্যায়	প্রকল্পের ধরন, ব্যয় নিরূপণ ও অর্থায়ন	৩০
ষষ্ঠ অধ্যায়	ব্যবসায়ের প্রাথমিক কার্যাবলি	৩৮
সপ্তম অধ্যায়	ব্যবসায় পরিকল্পনা	৫১
অষ্টম অধ্যায়	হিসাব রক্ষণ ও মুনাফা পরিকল্পনা	৫৮
নবম অধ্যায়	উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ	৭০
দশম অধ্যায়	ব্যবসায় শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	৭৯

অধ্যায় ১

ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা

অধ্যায় সূচি

১. ব্যবসায় উদ্যোগের ধারণা

২. উদ্যোক্তার সংজ্ঞা

৩. উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য

৪. উদ্যোক্তার গুণাবলি

৫. ব্যবসায় উদ্যোগের আওতা

৬. উদ্যোক্তার গুণাবলি বিশ্লেষণ (কেইস স্ট্যাডি বা ইতিবৃত্ত)

ব্যবসায় উদ্যোগের ধারণা

সাধারণত উদ্যোগ হচ্ছে ঝুঁকি (Risk) আছে জেনেও লাভের আশায় কষ্টসাধ্য কাজে হাত দেয়া। আর শিল্পোদ্যোগ বা ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে বুঝায় লাভবান হওয়ার আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া। উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা শব্দ দুটি একটি অন্যটির সাথে এমনভাবে জড়িত যে, একটির ব্যাখ্যা অন্যটিকে বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয়। বলা হয়ে থাকে যে, যার উদ্যোগ আছে তিনিই উদ্যোক্তা।

অতএব শিল্প বা ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের কার্যক্রমকে বুঝায়, আর যিনি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাকে বলা যায় উদ্যোক্তা। Entrepreneurship এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগ এবং Entrepreneur এর প্রতিশব্দ হিসেবে উদ্যোক্তা ও শিল্পদ্যোক্তা ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। পাশ্চাত্য জগতে Entrepreneurship একটি বহুল পঠিত বিষয়। সেখানকার পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, Entrepreneurship বলতে প্রধানত ব্যবসায় ও শিল্প সংক্রান্ত কর্মোদ্যোগকেই বুঝায়। উপরিউক্ত আলোকে আলোচ্য পুস্তকে Entrepreneur এর প্রতিশব্দ হিসেবে শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগ এবং Entrepreneur এর প্রতিশব্দ হিসেবে উদ্যোক্তা ও শিল্পোদ্যোক্তাকে সমর্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

উদ্যোক্তার সংজ্ঞা

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির বিভিন্ন অবস্থার আলোকে বিভিন্ন শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্যোক্তার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিচে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল।

উদ্যোগ বিষয়টি ক্যানটিলন (Cantillon) সর্বপ্রথম অর্থনীতিতে প্রচলন করেন বলে ধারণা করা হয়। তাঁর মতে, "উদ্যোক্তা হচ্ছেন একজন প্রতিনিধি (Agent), যিনি পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট মূল্যে উপকরণসমূহ সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে পণ্য প্রস্তুত করেন, যার বিক্রয়মূল্য অনিশ্চিত।" বলা যায় উদ্যোক্তার নিকট পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্দিষ্ট হলেও বিক্রয়মূল্য অনিশ্চিত। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী শিল্পোদ্যোক্তা একজন ব্যক্তি যিনি শিল্পের ঝুঁকিপূর্ণ মূলধন (Venture Capital) পরিচালনা করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঝুঁকি নেন।

জে, বি, সে' (J. B. Say) বলেন যে, শিল্পোদ্যোক্তা হচ্ছেন অর্থনৈতিক প্রতিনিধি তিনি উৎপাদনের সকল উপাদান যেমন শ্রমিক, মূলধন ও ভূমি একত্রিত করেন। উৎপাদিত পণ্যের মূল্য তিনি এমনভাবে নির্ধারণ করেন, যার ফলে উপকরণসমূহের ব্যবহার এবং মূলধন পুনর্গঠন নিশ্চিত হয়। এছাড়াও শ্রমিকের মজুরি, মূলধনের সুদ ও খাজনা পরিশোধ করে এবং তার প্রত্যাশিত মুনাফার ব্যবস্থা করেন। এ সংজ্ঞাটি ক্যানটিলনের প্রদত্ত সংজ্ঞার উন্নততর রূপ। সমন্বয়, সংগঠন এবং কাজের উপর J. B. Say বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, সফলকাম হতে হলে শিল্পোদ্যোক্তার পণ্যের ভবিষ্যতে চাহিদার পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা, সম্ভাব্য উৎপাদন ব্যয় ও প্রশাসনিক কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

জোসেফ এ. সুমপিটার (Joseph A Schumpeter) মনে করেন যে, "উদ্যোক্তা এমন একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর সৃজনশীল ও উদ্ভাবনি শক্তি দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন ও উন্নয়নে গতিশীলতা সঞ্চার করেন।"

তিনি শিল্পোদ্যোক্তাকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতিপয় উপাদানের উদ্ভাবনকারী বলে গণ্য করেছেন। এ উপাদানগুলো নিম্নরূপ : ১. নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি ২. নতুন বাজার সৃষ্টি ৩. কাঁচামাল সরবরাহের নতুন উৎস সন্ধান ৪. শিল্প পরিচালনায় নতুন ব্যবস্থাপনা–কৌশল সৃষ্টি ইত্যাদি।

সুমপিটার আবিষ্কারক ও উদ্ভাবনকারীদের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। আবিষ্কারক সম্পূর্ণ নতুন জিনিস বা নতুন ধারণার উদ্ভাবন করেন। উদ্ভাবনকারী আবিষ্কৃত জিনিস বা ধারণাকে কাজে প্রয়োগ করে থাকেন। এভাবে উদ্যোক্তা উদ্ভাবনকারীর কার্য সম্পাদন করেন।

উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। তার ফলে বৈশিষ্ট্যগুলোকে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে ভাগ করা যায়।

১. মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে কতগুলো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল : ১. ক্ষমতা ২. সাফল্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ৩. স্বাধীনতা ৪. আক্রমণাত্মক স্পৃহা ৫. স্বীকৃতি ৬. বদান্যতা ৭. ঝুঁকি গ্রহণের মনোভাব ৮. দূরদৃষ্টি ৯. সৃজনশীলতা ১০. অধ্যবসায় ১১. চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস ১২. জানার ইচ্ছা ১৩. গ্রহণযোগ্য উদ্ভাবনী শক্তি ১৪. আত্মবিশ্বাস ১৫. ইচ্ছাশক্তি ১৬. কাজ করার দৃঢ়তা ১৭. প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি।

২. অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য : (১) পেশাগত অভিজ্ঞতা (২) মূলধন যোগান ও ব্যবহারের ক্ষমতা (৩) ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা (৪) প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা (৫) সুযোগ–সুবিধার ব্যবহার ইত্যাদি।

৩. সামাজিক বৈশিষ্ট্য : (১) নেতৃত্ব (২) পৈতৃক গুণাবলির প্রতিফলন (৩) সামাজিক কার্যকলাপে উদ্যোগ গ্রহণ (৪) বংশ–মর্যাদা ও পারিবারিক মর্যাদা।

৪. সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য : (১) বয়স (২) শিক্ষা (৩) বিক্রয় করার গুণাবলি (৪) আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব (৫) কৌশল ও সততা (৬) সরলতা (৭) তৎপরতা (৮) মুনাফার প্রতি আকর্ষণ (৯) ত্যাগী মনোভাবের প্রভৃতি।

উদ্যোক্তার গুণাবলি

উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা থেকে তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। অনেক সময় বলা হয় যে, উদ্যোক্তাগণ জন্মগতভাবেই উদ্যোক্তা। অর্থাৎ জন্মসূত্রেই তিনি বহু ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী হন যা তাঁকে উদ্যোক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে সহায়তা করে। বর্তমান সময়ে অবশ্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সুযোগ–সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা যায়। একজন উদ্যোক্তার প্রধান প্রধান গুণসমূহ হল : ১. আত্মবিশ্বাসী ২. স্বাধীনচেতা ৩. উদ্যমী ৪. সাহসী ৫. অধ্যবসায়ী ৬. সংবেদনশীল ৭. সৃজনশীল ৮. উদ্ভাবনি শক্তিসম্পন্ন ৯. কঠোর পরিশ্রমী ১০. ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা ১১. নেতৃত্বদানের যোগ্যতা ১২. পুঁজি সংগ্রহের ক্ষমতা। তাঁরা দেশে বিরাজমান অর্থনৈতিক সুযোগ–সুবিধাগুলো চিহ্নিত করে তা বাণিজ্যিক লক্ষ্যে ব্যবহার করতে সক্ষম। শিল্প উন্নয়নের জন্য সরকার প্রদত্ত সুযোগের ব্যবহারে তারা দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সীমিত সম্পদের মধ্যে পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সফল উদ্যোক্তা সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে বাধাগুলো আগে থেকে অনুমান করেন এবং সেগুলো মোকাবিলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলা এবং অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা সফল উদ্যোক্তার বিশেষ গুণ বলে চিহ্নিত। তাঁরা ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বিচক্ষণতার সাথে নিরূপণ করেন এবং তা এড়ানো বা কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি গ্রহণ সফল উদ্যোক্তার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। ব্যবসায় থেকে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনের অনিশ্চয়তাকেই ব্যবসায়ের ঝুঁকি হিসেবে গণ্য করা হয়। একজন সফল উদ্যোক্তা পূর্বেই ঝুঁকির সম্ভাব্য কারণ ও মাত্রা অনুমান করেন এবং সেগুলো মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সফল উদ্যোক্তা গতিশীল নেতৃত্ব গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন।

সফল উদ্যোক্তা পুঁজি সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থসংস্থান ও তার যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত ও জনসম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে দক্ষতার পরিচয় দেন। ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে সফল উদ্যোক্তা গভীর জ্ঞান রাখেন। পুরাতন ও নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে সফল উদ্যোক্তার ধারণা সময়োপযোগী। উদ্ভাবনী শক্তির বলে তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার নতুন উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ এবং তা ব্যবহার করেন। তাঁরা শিল্প উদ্যোগের নব নব দিগন্ত উন্মোচন করেন।

উদ্যোক্তা চ্যালেঞ্জমূলক কাজ করতে বিশেষ আনন্দ পান। ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনে নিরলস শ্রম দেন এবং ব্যক্তিগত আরাম–আয়েশ, ভোগ–বিলাস পরিহার করেন। নিজের ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তের প্রতি এত আস্থাশীল যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবিরাম কাজ করেন এবং ফলাফল অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কাজে নিয়োজিত থাকেন। কোনো কারণে প্রথম বার ব্যর্থ হলে, ব্যর্থতার কারণ খুঁজে দ্বিতীয় বার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। কাজে সাফল্য অর্জনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁদের চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নতুনকে জানা ও নতুন কিছু শেখা তাঁদের চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রকৃত উদ্যোক্তারা নিজেদের ভুল অকপটে স্বীকার করেন এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। নিজের অভিজ্ঞতা এবং অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং নিজের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ উদ্যোক্তার একটি বিশেষ গুণ। সফল উদ্যোক্তা তাঁদের কাজের সাফল্যে পরিতৃপ্তি ও অসীম আনন্দ পান।

ব্যবসায় উদ্যোগের আওতা

ব্যবসায় উদ্যোগের কার্যক্ষেত্রের আওতা ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। তবে উদ্যোগের ক্ষেত্রগুলোকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়, ১. কেনা–বেচা, ২. সেবামূলক ও ৩. উৎপাদনমূলক। প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আকার ছোট, মাঝারি ও বৃহদাকার হতে পারে। আকার ও প্রকৃতিভেদে ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলির বিস্তৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন হতে পারে।

উদ্যোক্তার গুণাবলি বিশ্লেষণ (কেইস স্টাডি বা ইতিবৃত্ত)

জনাব জুবের আলী ১৯২৮ সালে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা থানার টেনডং–এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় এটা কেউ অনুমান করতে পারেনি যে একদিন তিনি বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম ধনী ব্যক্তি হবেন এবং ব্যাংকিং শিল্প ক্ষেত্রে একজন অন্যতম ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন। জুবের আলী এক গরিব কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পরিবার বাংলাদেশ ত্যাগ করে মায়ানমার চলে যায় এবং সেখানকার একটি দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চলে তিনি ১২ বছর বাস করেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা কখনই যথেষ্ট খাবার যোগাড় করতে পারত না। তিনি মোট ৫ বছর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন এবং এর অর্ধেক সময়ই খেতের কাজে ব্যয় করেন। এলাকাটি ছিল একটি পাহাড়ি অঞ্চল। চাষাবাদ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ছিল, মাটি কর্ষণের জন্য বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হত। তাই বৃষ্টি হলে তিনি ক্লাস ত্যাগ করে মাঠে চলে যেতেন। এ রকম একটি দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বড় হয়ে পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির এক বিশাল ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি কীভাবে এটা করতে পেরেছিলেন?

জনাব জুবের আলী একজন কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। জীবনে তিনি যা কিছু করেছেন তাই উৎকৃষ্টভাবে করার চেষ্টা করেছেন। সর্বোত্তমভাবে কাজ সম্পাদন করার গুণ ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে লক্ষ করা যায়। এর প্রতিফলন তাঁর পরবর্তী জীবনেও ঘটে যেখানে তিনি অন্যের চেয়ে ভালো করায় সচেষ্ট ছিলেন।

তের বছর বয়সে তিনি বার্মার একজন গ্রামীণ রসায়নবিদের সঙ্গে শিক্ষানবীশ হিসেবে কর্মরত হন। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের জটিল নাম তিনি খুব সহজেই আয়ত্ত করে ফেলেন। তার এই গুণে চমৎকৃত হয়ে মালিক তাঁকে চিকিৎসক হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু গ্রামীণ চিকিৎসক না হয়ে তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর দু বছর পর তিনি মায়ানমার ছেড়ে ভারতে চলে যান এবং একটা কাঠের দোকানে বাবুর্চি হিসেবে চাকরি নেন। জীবন যাত্রা সে সময়ে এত ব্যয়বহুল ছিল যে, বাড়তি উপার্জনের জন্য তাঁর মূল দায়িত্বের পাশাপাশি আরও কিছু কাজ করে দিতেন, যেমন– দোকান পরিষ্কার করা, খদ্দেরের গাড়িতে কাঠ তুলে দেয়া এবং কাঠ বিক্রির অন্যান্য কাজে মালিককে সাহায্য করা।

এ সময় তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি লক্ষ করা যায়। কাঠের বিভিন্ন প্রকার এবং আকার হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন কাঠের মূল্য এর প্রকার ও আকারভেদে নির্ধারিত হয়ে থাকে। জুবের আলী দোকানের সব জাতের কাঠ এবং এগুলোর মূল্য সহজেই মনে রাখতে পারতেন এবং প্রয়োজনে খদ্দেরকে সঠিক কাঠের সঠিক দাম মাপ দেখেই মুখে মুখে হিসাব করে বলে দিতেন।

জনাব জুবের আলীর এ স্মৃতিশক্তি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতে তার সফলতার পেছনে যথেষ্ট কাজ করেছে বলে অনুমান করা যায়। তাঁর এতগুলো গুণ দোকানের মালিককে মুগ্ধ করে ফেলে। এ সময় মালিক আরও লক্ষ করলেন যে, তাঁর হাতের লেখা খুব সুন্দর। এর পরপরই তিনি তাঁকে তাঁর দোকানের কেরানি হিসেবে নিয়োগ করেন। এ সময় তিনি মালিকের সহযোগিতায় আবার লেখাপড়া শুরু করেন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর জীবিকার তাগিদে তিনি আর আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়া করেননি। যদিও লেখাপড়ার দিকে তার ছিল অদম্য স্পৃহা। সময় পেলেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়ালেখা করতেন।

জনাব জুবের অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। তিনি অহেতুক লোক দেখানো খরচ অপছন্দ করতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সুদূরপ্রসারি ছিল। এসবের প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তিনি একটি বিশেষ অনুদান থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে নিজের বইয়ের দোকান দিলেন। সে সময় অন্যান্য লোকেরা একই অনুদান থেকে নেয়া অর্থ শুধু বিলাসবহুল দ্রব্যের পেছনে খরচ করেছে। তিনি সবসময়ই ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতেন এবং এ কারণে তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যাবার পর তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন। তার দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে ব্যবসার অনেক সুযোগ তাঁর হাতের কাছে আছে। তিনি তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে কাঠের ব্যবসায় শুরু করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ও পরবর্তীতে মায়ানমার থেকে কাঠ এনে তিনি ঢাকার আসবাবপত্রের দোকানে সরবরাহ করতে থাকেন।

জনাব জুবের আলী তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির গোড়া শক্ত করার জন্য শিল্পের উন্নতির প্রয়োজন অনুভব করলেন। তিনি ভেবে দেখলেন যে শিল্পের বিকাশ হলে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। তাই তিনি শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

১৯৫২ সালে তিনি ব্যাংক ঋণ নিয়ে প্রায় চার লক্ষ টাকা পুঁজি খাটিয়ে চট্টগ্রাম কালুরঘাট অঞ্চলে একটি দিয়াশলাই কারখানা স্থাপন করেন। দিয়াশলাই কারখানার মাধ্যমেই তার শিল্প জগতে পদার্পণ। ১৯৫৬ সালে তিনি ঐ সময়কার তাঁর সবচেয়ে বড় প্রকল্প রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস–এর কাজ শুরু করেন।

জুবের আলী যখন এ দেশে কারখানা স্থাপনের প্রচেষ্টায় রত তখন তাকে পদে পদেই বাধার সম্মুখীন হতে হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং ব্যাংকগুলো কখনই একজন বাঙালি ব্যবসায়ীকে সাহায্য করেনি। একটি বিদেশি ব্যাংক তাকে সাহায্য না করলে কারখানা স্থাপন তার পক্ষে কখনই সম্ভব হতো না। কিন্তু তিনি ছিলেন অধ্যবসায়ী। কখনই কোন ব্যাপারে হতোদ্যম হওয়া তার চরিত্রে ছিল না।

ইস্ট–ওয়েস্ট ব্যাংকের আজকের যে সমৃদ্ধি তা জনাব আলীর উদ্যোক্তাসুলভ গুণাবলির উৎকৃষ্টতাই প্রমাণ করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শেষে তিনি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়েন। ব্যাংকিং এর ব্যাপারে তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন। ব্যাংক ব্যবসায় অনেক টাকার লেনদেন হবে এ কথা ভেবে তিনি প্রথমে রোমাঞ্চিত হয়ে পড়েন। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দেখা গেল ব্যাপারটি জটিল। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শুরুটা ছিল অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং এর সফলতার জন্য শুধুমাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভর করা যায়নি। জনাব জুবেরের দক্ষতা, উদ্যম এবং দূরদর্শিতাই ব্যাংকে সফলতা এনে দিল।

তিনি বাংলাদেশে প্রথম ঋণদানকারী কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন যা মূলত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল। এশিয়া ট্রাস্ট কোঃ লিঃ নামক এই প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই দেশের প্রভাবশালী ও বিশ্বস্ত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ের উৎসে পরিণত হয়। তাঁকে এর জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে।

ব্যবসায়ীগণ কোম্পানির অফিসে আসার আগেই তিনি সকল বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ের হার জেনে নিতেন। বিনিময় হার সংগ্রহের জন্য তিনি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে যেতেন। পরবর্তীতে বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেন।

এ সময় ইস্ট–ওয়েস্ট ব্যাংকের আর্থিক সংকট দেখা দিল। রিয়েল এস্টেট ব্যাংকের অধিক বিনিয়োগের ফলে নগদ অর্থের তীব্র সমস্যা দেখা দেয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তখন জুবেরকে যিনি ব্যাংকের একজন শেয়ারহোল্ডার ছিলেন, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এ সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি এশিয়া ট্রাস্ট কোং থেকে তাঁর অভিজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগ করলেন।

তিনি দেখলেন যে, বিভিন্ন রকমের ব্যবসায়িক লেনদেনে হুন্ডি বা নগদ অর্থ লেনদেন করা হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের ভূমিকা নগণ্য। তাই তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, সকল প্রকার বৈদেশিক বাণিজ্য, ঋণ, অন্যান্য আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে করাটা সুবিধা ও লাভজনক। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী জনাব আলমকে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা এবং ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করার দায়িত্ব দেন।

তাঁর নেতৃত্বে ইস্ট–ওয়েস্ট ব্যাংক অন্যান্য স্থানীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয় এবং সেটা স্থানীয় এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মধ্যে সেরা হয়ে আছে।

স্থানীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে তিনি প্রথম বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণকে বিস্তারিত পরামর্শ ও সেবামূলক সহযোগিতা প্রদানের পদক্ষেপ নেন। ব্যাংকের কর্মচারিবৃন্দ, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কারবারিগণের হয়ে সমস্ত কাগজপত্র পূরণ করে দিত আর ঐ সমস্ত ব্যবসায়ী ও কারবারিগণের যা করতে হতো তা হল কোম্পানির সিল দেয়া। শীঘ্রই যখন স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলে ইস্ট–ওয়েস্ট ব্যাংকে সহযোগিতা ও পরামর্শের সাথে আমদানি–রপ্তানি বাণিজ্যে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যায়, এ খবর ছড়িয়ে পড়ল তখন, ব্যাংকের অগ্রগতি দ্রুত বেড়ে চলল এবং এভাবেই এটা বাংলাদেশ ব্যাংকিং এর অগ্রভাগে থেকে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকল।

ব্যাংকের কার্যের জন্য জরুরি সকল ধরনের তথ্য তিনি সংগ্রহ করতেন। তিনি ব্যবসায়ের কাজে সহায়ক হতে পারে এমন নানা রকমের দৈনিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রতিদিন সকালবেলায় পড়তেন এবং অফিসের কর্মচারিদের সাথে আলোচনা করতেন।

তিনি সবসময়ই নতুন ধ্যানধারণার প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং কোনো সময়ই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এর প্রমাণ মিলে যখন তিনি ১৯৮৫–৮৬ সালে ব্যাংকে কম্পিউটার চালু করেন। ব্যবস্থাপনার নতুন নতুন ধারণাগুলোকে তিনি গ্রহণ করতেন এবং ব্যাংক কর্মচারিদের তাদের কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য তিনি তাদের কাছে ব্যাংকের শেয়ার বিক্রির ব্যবস্থা করেন।

তিনি অত্যন্ত সুদক্ষ প্রশাসক ছিলেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর বিচক্ষণতা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁর একই সাথে অনেকগুলো ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিল। কেননা তিনি বিভিন্ন বিষয় আলাদা এবং স্পষ্ট দেখতে পারতেন।

তাঁর আরও একটি উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল। তাঁর চলার পথে কোনো বাধা বা সমস্যা আসলে তিনি ভেঙে পড়তেন না। তিনি ধৈর্যের সাথে সহজেই মোকাবিলা করতেন। জনাব জুবেরের সাফল্যের পেছনে অনেক উপাদানের মধ্যে একটি হল যে, তিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে যে মহলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন, সে সবগুলোই রক্ষা করে গেছেন। সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে জনাব জুবের আলীর সখ্য তাঁকে ব্যবসায়ে লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করত।

তিনি নিজে পরিশ্রম করতেন এবং একজন ভালো ব্যবস্থাপক হওয়ার কারণে অন্যদেরকে পরিশ্রম করাতে পারতেন। প্রথম দিকে তাঁর কর্মকর্তাদের জন্য অনেক মাস কোনো ছুটি ছিল না। আর শনি, রবিবার বাড়তি সময় পরিশ্রম করে, এমনকি ছুটির দিনগুলোতেও কাজ করে গ্রাহকদের চাহিদা মিটিয়ে দিতেন।

যে সমস্ত লোক নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেরই ব্যক্তিগত শত্রু থাকতে দেখা যায়। কিন্তু তার কোনো শত্রু ছিল না। প্রতিযোগী ব্যবসায়ীগণের সঙ্গে সবসময়ই সদ্ভাব বজায় রাখতেন। প্রয়োজনবোধে কোনো সুবিধা বা ব্যবসায় অন্যকে ছেড়ে দিতেন যাতে প্রতিযোগীদের মনে শত্রুভাব না থাকে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, কর্মজীবনে শত্রু থাকলে তাকে বন্ধু ভেবে জয় করা উচিত। শত্রু ভেবে পরাজিত করে নয়। এভাবেই জনাব জুবের আলী তার ব্যবসায়িক জীবনে সাফল্য অর্জন করেছেন।

অনুশীলন–১

উদ্দেশ্য

এ অনুশীলন শেষে শিক্ষার্থীরা একজন উদ্যোক্তা হতে হলে কী কী গুণ থাকা দরকার সে বিষয়ে ধারণা পাবে।

ধাপসমূহ

১ম ধাপ–শিক্ষার্থীদের প্রথমে কয়েকটি দলে ভাগ করতে হবে।

২য় ধাপ–দলে প্রত্যেকে সফল উদ্যোক্তার কেইস বা ইতিবৃত্ত পড়বে। পড়া শেষে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে উদ্যোক্তার গুণাবলি বের করবে (যেগুলোর কারণে তিনি সফল উদ্যোক্তা হতে পেরেছেন) এবং বড় সাদা কাগজে লিখবে।

৩য় ধাপ–প্রত্যেক দল থেকে একজন ছাত্র/ছাত্রী উদ্যোক্তার চিহ্নিত করা গুণাবলি উপস্থাপন করবে ও দেয়ালে টানাবে।

৪র্থ ধাপ–শিক্ষক প্রত্যেক দলের উপস্থাপনার পর উদ্যোক্তার প্রতিটি গুণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করবেন, একজন ব্যবসায়ী হবার জন্য শিক্ষার্থীদের এ গুণগুলো আছে কিনা তা আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের যে গুণগুলো নেই সেগুলো সফল ব্যবসায়ের জন্য অর্জন করার কথা বলবেন।

অনুশীলন–২

খেলার নাম : ঝুঁকি গ্রহণ

উদ্দেশ্য

খেলা শেষে শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় ঝুঁকি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ব্যবসায় ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবে।

সময় : ০২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

উপকরণ

বেতের রিং ছোট ৪টা – ৯.৬″ ব্যাসের, বড় ৪টা – ১৩.৫″ ব্যাসের।

১৮″ ব্যাসের একটি পাটাতন– যার মাঝখানে ১৪″ লম্বা একটি খুঁটি শক্ত করে লাগানো থাকবে।

২″ মাপের মাসকিং টেপ (প্রয়োজনমতো)

বোর্ড, চক, নোট বুক, ডাস্টার ইত্যাদি।

খেলার প্রস্তুতি

– খুঁটি যুক্ত পাটাতনকে মাসকিং টেপ দিয়ে মেঝের উপর শক্তভাবে বসাতে হবে, যাতে নড়াচড়া না করে।

– পাটাতনের খুঁটি বরাবর ১৩.৬″ লম্বা দাগ কেটে সেটা আড়াআড়িভাবে দুই ইঞ্চি মোটা দাগ দিয়ে সাতটি ধাপে ভাগ করতে হবে। আড়াআড়ি দাগটি হবে দুই ফুট লম্বা এবং বড় দাগের দুই দিকে সমান প্রথম ধাপ খুঁটি থেকে ৪১″ দূরে থাকবে। প্রতিটি ধাপের মধ্যে দূরত্ব থাকবে ১৮″। এভাবে প্রথম ধাপ–০, ২য় ধাপ–১, ৩য় ধাপ–৩, ৪র্থ ধাপ–৮, ৫ম ধাপ–১৫, ৬ষ্ঠ ধাপ–২৫, ৭ম ধাপ–৪০ এবং ৮ম ধাপ–৬০ নম্বরযুক্ত হবে।

খেলার নিয়ম

* ছোট অথবা যে কোনো রিং ই ০ ধাপ থেকে ছুড়লে কোন টাকা পাওয়া যাবে না। সেটা যেখানেই পড়ুক। “০” ধাপ ছাড়া বড়টা যে ধাপ থেকে ছোড়া হবে সেখান থেকে খুঁটির মধ্যে ঢুকলে/পড়লে সেই দাগ নম্বরের সমপরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে। ছোটটার বেলায় সংশ্লিষ্ট নম্বরের দ্বিগুণ টাকা পাওয়া যাবে। যে কোনো রিং খুঁটির বাইরে পড়লে শূন্য টাকা পাওয়া যাবে। পাটাতনের বাইরে পড়লে দুটোর জন্যই উল্লিখিত সমপরিমাণ টাকা জরিমানা হবে।

* রিং ছোড়ার সময় কোনো বার আড়াআড়ি দাগের উপর পা পড়লে সে বারের খেলাটা বাতিল বলে গণ্য হবে।
* রিংগুলো নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিতে হবে। প্রতিটি বড় রিং–এর দাম ১ টাকা এবং ছোট রিং–এর দাম ২ টাকা। (কোম্পানি প্রতি ছোট বড় মিলিয়ে অথবা বড় বা ছোট ২০টা করে রিং কেনার ব্যবস্থা রাখা ভালো।
* শিক্ষার্থীদেরকে ৪টা কোম্পানিতে ভাগ করা হবে।
* কোম্পানির প্রত্যেকেই একবার করে (ছোট ২টা+বড় ২টা রিং দিয়ে) অনুশীলনের সুযোগ পাবে।
* প্রত্যেক কোম্পানি পরিকল্পনার জন্য সময় পাবে ১৫ মিনিট।
* পরিকল্পনার সময় কোম্পানিগুলো নিচের কাজগুলো সম্পন্ন করবে।
  ক) কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্বাচন।
  খ) ছোট বড় মিলিয়ে অথবা এককভাবে ছোট বা বড় কতগুলো রিং কেনা হবে।
  গ) কে কে কোন কোন রিং এবং কোন কোন ধাপ থেকে খেলবে।
* রিং কেনার জন্য সমুদয় টাকা কোম্পানির সকলে সমানভাবে দেবে।
* কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক খেলার পরিচালককে (শিক্ষক) পরিকল্পনা মোতাবেক সকল তথ্য জানাবেন এবং রিং এর দাম পরিশোধ করবেন। খেলার পরিচালক (শিক্ষক) প্রাপ্ত তথ্যগুলো কোম্পানি অনুযায়ী আলাদা করে বোর্ডে লিখবেন। বোর্ডে একবার লেখা হয়ে গেলে তা আর বদলানো যাবে না।
* এর পর প্রত্যেক কোম্পানি একে একে চূড়ান্ত খেলা খেলবে। খেলার ফলাফল বোর্ডে লেখা হবে।
* যে কোম্পানি সবচাইতে বেশি লাভ করতে পারবে তাদেরকে রিং বিক্রয় ও প্রাপ্ত জরিমানা বাবদ সমুদয় টাকা অথবা ঐ কোম্পানির আসলসহ লাভের টাকা প্রদান করা হবে।
* অন্যান্য কোম্পানিগুলো কোনো টাকা পাবে না বরং যে কোম্পানির জরিমানা হবে তাদের জরিমানার পুরো টাকাটাই আদায় করতে হবে।
* যদি প্রথমবার কোনো দলই জিততে না পারে তবে দ্বিতীয়বার খেলাতে হবে। সকল নিয়ম–কানুন ঠিক রেখে পরিকল্পনা ও খেলার সময় কমিয়ে দিতে হবে।
* খেলার পূর্বাপর সকল তথ্য সহযোগী পরিচালনাকারী লিখে রাখবেন। বিশেষ করে অনুশীলনের সময় কে কোথা থেকে কোন রিং ছুড়ল এবং কৃতকার্য হল, পরিকল্পনার সময়ে কে কতটুকু অংশ গ্রহণ করল, কোন কোম্পানি কতটুকু সময় কাজে লাগালো তা নোট করবেন।
* খেলা শেষে অংশগ্রহণকারীরা যার যার জায়গায় বসবে।
* খেলা পরিচালনাকারী কে কত টাকা লোকসান করল তা হিসাব করে বুঝিয়ে দেবেন।
* যে কোম্পানি সবচাইতে বেশি লোকসান বা কম লাভ করেছে, তার কারণ সেই কোম্পানি প্রত্যেকের কাছ থেকে এক এক করে শুনবেন এবং তা বোর্ডে লিখবেন। একইভাবে যে কোম্পানি সবচাইতে বেশি লাভ করেছে তার কারণও বোর্ডে লিখবেন।
* খেলার পরিচালক অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আসা মন্তব্যগুলোকে একে একে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেবেন।

শিক্ষণীয় বিষয়

– ঝুঁকি অবশ্যই নিতে হবে, তবে যতটুকু সয়ে নেয়া যায়।
– ঝুঁকি নিতে হবে পরিকল্পিতভাবে এবং ধাপে ধাপে।
– জানা থেকে অজানা বা সহজ থেকে কঠিনের দিকে যেতে হবে।

(এখানে বড় রিংটি হল প্রচলিত পদ্ধতি– যা সহজেই খুঁটিতে ঢুকানো যায়। এর দাম কম, ঝুঁকি কম অপরদিকে ছোট রিংটি হল অপ্রচলিত পদ্ধতি–যা খেলা কঠিন, দাম বেশি এবং ঝুঁকিও বেশি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **Entrepreneur–এর প্রতিশব্দ হল–**

ক. উদ্যোক্তা ও শিল্পোদ্যোক্তা
খ. ব্যবসায় ও শিল্প সংক্রান্ত কর্মোদ্যোক্তা
গ. শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায় উদ্যোগ
ঘ. উদ্যোক্তা

২. **যে গুণগুলো উদ্যোক্তার ব্যবসায়ের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ–**

i. মুনাফার প্রতি আকর্ষণ
ii. ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা
iii. আত্মবিশ্বাসী

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৩ থেকে ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও]

উদ্যোগের ক্ষেত্রগুলোকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একজন সফল উদ্যোক্তা পুঁজি সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থের সংস্থান ও তার যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করেন।

৩. **নিচের কোনটি উদ্যোগের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায় ?**

i. সেবামূলক
ii. অর্থসংস্থান
iii. ঝুঁকি গ্রহণ
iv. বাজার সৃষ্টি

৪. **পুঁজি সংগঠন উদ্যোক্তার কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য ?**

ক. মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
খ. অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য
গ. সামাজিক বৈশিষ্ট্য
ঘ. ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

৫. **উদ্যোক্তার নিকট পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্দিষ্ট হলেও বিক্রয়মূল্য অনিশ্চিত কেন ?**

ক. বাজারে পুরাতন প্রতিযোগী বিদ্যমান
খ. প্রতিযোগীদের পণ্যের দামের পরিবর্তন
গ. বাজারে পণ্যের চাহিদা পরিবর্তন
ঘ. মানসম্মত পণ্যের সঠিক দাম প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা

৬. **জোসেফ ও সুমপিটার মনে করেন উদ্যোক্তা তার সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। এখানে উদ্যোক্তার কোন বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ?**

ক. আত্মবিশ্বাস
খ. নেতৃত্ব
গ. সৃজনশীলতা
ঘ. ঝুঁকি গ্রহণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব ইসমাইল একজন সফল উদ্যোক্তা। অত্যন্ত দরিদ্র ও সাধারণ অবস্থা থেকে ব্যবসায় শুরু করে আজ তিনি বাংলাদেশের সুপরিচিত এক ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি বিভিন্ন ব্যবসায় স্থাপন করেন। তিনি বর্তমানে কাঠ সরবরাহ, টেক্সটাইল মিলস, ব্যাংকিং, রিয়েল এস্টেটসহ নানাবিধ ব্যবসায় ও শিল্প কারখানা সুদক্ষভাবে পরিচালনা করছেন। তাঁর ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে তিনি সহস্রাধিক লোকের কর্মসংস্থান করেছেন। ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা একত্রিত করে মূলধন গঠন করে পুনরায় বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায়ের উন্নয়ন সাধনই তার প্রধান লক্ষ্য।

ক. উদ্যোক্তা কে ?

খ. অর্জিত মুনাফা একত্রিত করে মূলধন গঠন– কথাটির অর্থ কী ?

গ. জনাব ইসমাইলের মতো একজন সফল উদ্যোক্তা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় গড়ে তুলেছেন কেন ?

ঘ. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনাব ইসমাইলের মতো উদ্যোক্তার অবদান মূল্যায়ন কর।

২. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকরারি খাতেও উদ্যোক্তার সংযোজন হয়েছে। উদ্যোগ গ্রহণ এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে সংগঠিত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করাই উদ্যোক্তার প্রধান কাজ। উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ের নেতা বলা হয়। কারণ ঝুঁকি আছে জেনেও একজন উদ্যোক্তা ব্যবসায়ের কাজে হাত দেয়। উদ্যোক্তাকে একজন সৎ, সাহসী ও যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। উদ্যোক্তা সাংগঠনিক জ্ঞানসম্পন্ন, উদ্যমী এবং পরিশ্রমী হলে তার পক্ষে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কী ?

খ. উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ের নেতা বলা হয় কেন ?

গ. একজন উদ্যোক্তার কী কী গুণাবলি থাকা দরকার – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ভূমিকাই মুখ্য”–মূল্যায়ন কর।

অধ্যায় ২

আত্মকর্মসংস্থান

অধ্যায় সূচি

১. আত্মকর্মসংস্থানের সংজ্ঞা
২. আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব
৩. আত্মকর্মসংস্থানের প্রকারভেদ
৪. ব্যবসায় ও এর প্রকৃতি
৫. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সংজ্ঞা
৬. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা
৭. সুযোগের ব্যবহার সর্বোচ্চকরণ ও ঝুঁকি সর্বনিম্নকরণ

আত্মকর্মসংস্থানের সংজ্ঞা

নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আরও একটু স্পষ্ট করে বলা যায় যে, নিজস্ব অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়।

আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব

মানুষের জীবিকার্জনের সাথে কাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আমাদের সবার জীবন ধারণের জন্য অর্থ উপার্জন একান্ত অপরিহার্য। তাই সকল মানুষেরই লক্ষ্য থাকে একটি আকর্ষণীয় এবং যথার্থ কর্মসংস্থান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুর্বার গতি, অর্থনীতির অনগ্রসরতা, পরিকল্পনাবিহীন উন্নয়ন প্রভৃতি কারণে উন্নয়নশীল দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না। ফলে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায় এবং দিনে দিনে এ সমস্যা জাতীয় জীবনে অত্যন্ত ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। এ কারণে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সৃষ্টি করে। এ ধরনের জাতীয় সমস্যার প্রধান শিকার হয় যুবসমাজ। বেকার সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের লক্ষ্যে দেশের কর্মক্ষম জনগণের উপযুক্ত কর্মসংস্থান প্রত্যেক দেশের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য।

যে কোনো দেশে কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি। এ খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা আছে। কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস হিসেবে ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ

কর্মসংস্থানকে প্রধানত নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়– মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকরি, আত্মকর্মসংস্থান, ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ। নিচে কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

১. মজুরি ও বেতনভিত্তিক

মজুরি বা বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থান হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরি বা বেতন এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ, সুবিধার বিনিময়ে চাকরি। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চ পর্যায়ে বহু কর্মীর প্রয়োজন হয়। ফলে চাকরি কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। চাকরির নিরাপত্তা, নিয়মিত আয় এবং উচ্চ পদে প্রমোশন এবং নিয়মিত সুযোগ–সুবিধা থাকায় চাকরি সকলের নিকট আকর্ষণীয়। কিন্তু একটি দেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

অন্যদিকে বেসরকারি খাতে বিশেষ করে ব্যবসায় শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের সাথে সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বৃদ্ধি পায়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বেসরকারি খাত কর্মসংস্থানের একটি প্রধান উৎস। কিন্তু বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে চাহিদার তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তেমন সৃষ্টি হয়নি। ফলে মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর সম্ভাবনা আশাব্যঞ্জক নয়।

২. আত্মকর্মসংস্থান

আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে মজুরি/বেতনভিত্তিক চাকরির বিকল্প পেশার অন্যতম উপায়। আত্মকর্মসংস্থান পেশা বলতে বুঝায় যখন কোনো ব্যক্তি স্বীয় দক্ষতা বা গুণাবলির বলে সেবা দানের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা চালায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে যখন একজন কাঠ মিস্ত্রি একটি কাঠের ফার্মে বেতনের বিনিময়ে উপার্জন না করে নিজেই কাঠের আসবাবপত্র প্রস্তুত করে এবং এ থেকে যে আয় হয় তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। বলতে গেলে একটি দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার সিংহভাগই আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত।

বাংলাদেশেও এ ধরনের জনসংখ্যার পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগের কাছাকাছি। এ ধরনের কাজে আয়ের ধারাবাহিকতা অনিশ্চিত এবং বেশি সম্মানজনক নয় বিধায় মানুষ অনেকটা বাধ্য হয়ে এ পেশায় নিয়োজিত হয়। তবে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এ পেশা কারও কারও জন্য প্রচুর অর্থ উপার্জনের পথ সুগম করে দেয়। অনেক সময় চাকরির চেয়ে বেশি পরিমাণ উপার্জন করা যায়। যেহেতু শ্রম শক্তির সরবরাহের তুলনায় কর্মসংস্থানের উৎস হিসাবে অধিক সংখ্যক চাকরি সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেহেতু উন্নত এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেও চাকরির বিকল্প হিসেবে আত্মকর্মসংস্থান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নিজ মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ছোট-খাট ব্যবসায় যেমন-খুচরা দোকান, দরজির কাজ, লন্ড্রি, চুলকাটা, বৈদ্যুতিক মেরামত, খাবারের দোকান এবং আরও অনেক সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থেকে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জন এবং স্বনির্ভর পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা অর্জনের মানসিকতা সৃষ্টি করা।

৩. ব্যবসায়

কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্তমান বিশ্বে একটি স্বীকৃত বিষয়। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা অসীম। নিজ উদ্যোগে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করে জীবিকা অর্জনের উপায়ই ব্যবসায় উদ্যোগ। এক্ষেত্রে মালিক নিজেই ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন অথবা ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- ব্যাংক, বীমা, হোটেল, প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজ (শিল্প কারখানা), পরামর্শ দান কাজ, শিক্ষা দান প্রতিষ্ঠান এ সবকিছুই ব্যবসায় হিসেবে পরিগণিত। এ পেশা থেকে আয় উপার্জনের সম্ভাবনা সীমাহীন। শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় অনেকেই অতি সামান্য মূলধন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে ক্রমে ক্রমে সেই ব্যবসায় সম্প্রসারণ এবং নতুন ব্যবসায় শুরু করে বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়েছে। তবে ব্যবসায় অকৃতকার্য হওয়ার উদাহরণও বিরল নয়।

প্রকৃতপক্ষে তাদেরই ব্যবসায়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা উচিৎ যাদের মধ্যে উদ্যোক্তার গুণাবলি রয়েছে। বর্তমান সময়ে বৃহৎ শিল্প কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তি এবং স্বয়ংক্রিয় মেশিন/রোবট-এর ব্যবহার করা হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কুটির শিল্প এবং নতুন নতুন ব্যবসায় স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই আশাব্যঞ্জক। স্বল্প মূলধনে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার সুযোগ রয়েছে। আমাদের দেশের প্রকট বেকার সমস্যার প্রেক্ষিতে ব্যবসায়কে বিকল্প পেশা হিসেবে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা কর্মসৃষ্টির একটি অনন্য কৌশল হতে পারে।

ব্যবসায় ও এর প্রকৃতি

মানুষ তার প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন-চাল, ডাল, তেল, সাবান, কাপড়, জুতা, ওষুধ প্রভৃতি নিকটস্থ খুচরা দোকান বা সুপার মার্কেট থেকে ক্রয় করে থাকে। খুচরা দোকানের মালিক অথবা ব্যবস্থাপক এসব দ্রব্য পাইকারি বিক্রেতা বা সরাসরি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করতে পারে। প্রথম দুটি ট্রেডিং এবং পরেরটি উৎপাদন ব্যবসায়ের আওতায় পড়ে। মোট ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন খরচ ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে ব্যবধানই ব্যবসায়িক লাভ বা ক্ষতি। কেনাবেচা ও উৎপাদনমূলক ব্যবসায়ের কার্যকলাপের প্রকৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সংজ্ঞা

সাধারণত পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ, কর্মচারীর সংখ্যা, বিক্রয়ের পরিমাণ প্রভৃতি মাপকাঠিতে ব্যবসায়ের আকার নিরূপণ করা হয়। সরকারিভাবে সর্বোচ্চ তিন কোটি টাকা বিনিয়োগকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে গণ্য করা হয়।

সুতরাং স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ তিন কোটি টাকা বিনিয়োগকৃত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলে চিহ্নিত করা যায়। নিম্নলিখিত ব্যবসায়গুলো ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত :
১. মুদির দোকান ২. কাপড়ের দোকান ৩. খাবারের হোটেল ৪. মনিহারি দোকান ৫. ফলমূলের দোকান ৬. সেলুন ৭. ফটো স্টুডিও ৮. কনফেকশনারি ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক ও পেশার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। নিচের ছকগুলোতে উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধা ও অসুবিধাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

ছক–১
ব্যক্তিগত সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
– ব্যক্তিগত কৃতিত্ব – নিজের দক্ষতা ব্যবহারের সুযোগ – নতুন নতুন দক্ষতার উদ্ভাবন ও উন্নয়ন – দায়িত্ববোধ সৃষ্টি – সহজ নিয়ন্ত্রণ – সম্পদ বৃদ্ধি / সম্পদে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির সুযোগ – ক্ষুদ্র ব্যবসায় এবং বৃহৎ ব্যবসায় রূপান্তরের সুযোগ সৃষ্টি	– ব্যর্থতার / সাফল্যের ভীতি – ব্যক্তিগত সময় অপচয় – ব্যক্তিগত সুনাম ক্ষুণ্ন – অর্থের অপচয় – নেতৃত্বের অনুভূতি হারানো – আত্মবিশ্বাস হারানো

ছক–২
সামাজিক সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
– নিজ নামে ব্যবসায় – সমাজের সেবা প্রদানের সুযোগ – সামাজিক সম্মান – নতুন সম্পত্তি স্থাপন ও বিকাশ – প্রাতিষ্ঠানিক সহকর্মীদের প্রতিযোগিতাপূর্ণ চাপ থেকে অব্যাহতি – দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন	– প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাহী হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত – অপরের সাহায্যে সময় ব্যয় – প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত – বড় ব্যবসায়ী মহলের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত

ছক–৩
পারিবারিক সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
– একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনার্থে পরিবারের সবাই একত্রে কাজ করতে পারে – পারিবারিক সম্পত্তির অন্যান্য সুবিধা ভোগ – সাফল্যে পরিবারের গর্ববোধ এবং অধিকতর সহায়তা অর্জন	– বিনোদন সময়ের অভাব – পারিবারিক নিরাপত্তা হ্রাস – ব্যর্থতার ফলে পরিবারের হতাশা পারিবারিক বোঝাপড়া ও আন্তরিকতার অভাব

ছক–৪
পেশা হিসেবে সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
– অধিকতর পেশাগত উন্নতির সম্ভাবনা	– নিরাপত্তার অভাব
– ব্যবসায়ের কার্যাবলির সহজ নিয়ন্ত্রণ	– পদমর্যাদা বা পদোন্নতির অভাব
– কর্মক্ষমতার কার্যকর ব্যবহার	– ব্যর্থতায় অর্থ সংকট
– অধিকতর পরিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্বাহী গুণাগুণ অর্জন	– স্থায়ী চাকরির সুবিধা ক্ষেত্রে বঞ্চিত

সুযোগের ব্যবহার সর্বোচ্চকরণ ও ঝুঁকি সর্বনিম্নকরণ

ব্যবসায়ে সার্বিক সাফল্য অর্জনের জন্য প্রাপ্ত সুযোগসমূহ যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ ও তাদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ আবশ্যক। তেমনি ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ যথাযথভাবে চিহ্নিত করে সেগুলো যথাসম্ভব কমানো অপরিহার্য। নিচে সুযোগের ব্যবহার সর্বোচ্চকরণ এবং ঝুঁকি সর্বনিম্নকরণ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হল।

সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার এবং ঝুঁকি সর্বনিম্নকরণের উপায়সমূহ

সুযোগের ব্যবহার সর্বোচ্চকরণ	ঝুঁকি সর্বনিম্নকরণ
– দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ভূমিকা অনুধাবন করা	–ঝুঁকি বিশিষ্ট সুযোগগুলো এড়িয়ে চলা –নিজস্ব দুর্বলতা দূর করা
– নিজস্ব পণ্যের বাজার এলাকায় পরিচালিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত হওয়া	–পর্যাপ্ত মূলধনের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ – কেবল একটি পরিকল্পনা নিয়ে নিমগ্ন থাকা
– ঐ বাজার এলাকায় নিজের অবস্থান ও সম্ভাবনা স্থিরকরণ	–পরিবর্তনশীল বাজার –পরিস্থিতিকে গ্রাহ্য না করা
– পর্যবেক্ষণ এবং ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ক্রেতাদের চাহিদা ও অভ্যাসাদির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহকরণ	–কাঁচামাল, শ্রমিক, মূলধন এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিকল্প উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণ
– প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহকরণ – ক্রেতাদের প্রয়োজন মিটানোর উপর ভিত্তি করে দ্রব্য ও সেবাসমূহের শ্রেণীবিভাগকরণ	–ঝুঁকি সর্বনিম্নকরণের সব পদক্ষেপ নেয়ার পর ঝুঁকি সম্পর্কে চিন্তা না করা। প্রতিটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন না থাকা
– শিল্প সম্পর্কীয় তথ্য ও জ্ঞানের সূত্রসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া	–ব্যবসায় সম্পর্কিত নিজস্ব ধারণা ও অভিপ্রায়সমূহের গোপনীয়তা রক্ষা করা
– কাঠামোগত নমনীয়তা ও বিকল্প কার্য পরিকল্পনাসহ ব্যবসায়ের কৌশল প্রণয়ন	–ক্রেতা, কর্মচারিবৃন্দ, প্রকাশনাসমূহের মাধ্যমে বাজারের অব্যাহতভাবে মূল্যায়ন করা
– ব্যবসায় পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত নিজের শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ	–সমজাতীয় শিল্প এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহে বিস্তৃত একটি বন্ধুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং তাদের সাথে অব্যাহত যোগাযোগ বজায় রাখা।

উপসংহারে বলা যায় একজন ক্ষুদ্র শিল্প–উদ্যোক্তা ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে যদি উপরিউক্ত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে এ পেশায় তার সাফল্য এবং কার্যতুষ্টি নিশ্চিত হতে পারে।

অনুশীলন

খেলার নাম : রুমাল খেলা

উদ্দেশ্য

এ খেলা শেষে শিক্ষার্থীদের জড়তা কাটবে এবং ব্যবসায় করার সময় চারদিকে লক্ষ রাখার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবে।

সময় : ৩০ মিনিট

উপকরণ : রুমাল

ধাপসমূহ :

১ম ধাপ– শিক্ষার্থীরা বৃত্তাকারে বসবে।

২য় ধাপ– একজন রুমাল চোর নির্বাচন করতে হবে।

৩য় ধাপ– রুমাল চোর একটি রুমাল হাতে (রুমাল এমনভাবে হাতে রাখবে যেন কেউ দেখতে না পায়) করে শিক্ষার্থীদের পিছন দিকে বৃত্তের চারপাশে ঘুরতে থাকবে। ঘোরার সময় রুমাল চোর মাঝে মাঝে কারো পিছনে রুমাল রাখার অভিনয় করবে। এক পর্যায়ে রুমাল চোর রুমালটি কোনো একজনের পিছনে চুপি চুপি রেখে দিয়ে বৃত্তটি সম্পূর্ণ ঘুরে এসে যার পিছনে রুমাল রেখেছে, তাকে রুমাল দিয়ে মারতে থাকবে যতক্ষণ না সে উঠে রুমাল নেবে এবং রুমাল চোর তার জায়গায় বসে পড়বে। যার পিছনে রুমাল রাখা হয়েছে সে যদি বুঝতে পারে; তবে সে রুমাল হাতে করে নিয়ে উঠে রুমাল চোরের পিছনে দৌড়াতে থাকবে যতক্ষণ না রুমাল চোর তার জায়গায় বসে পড়ে। তবে কেউ পিছন দিকে তাকাতে বা এলোমেলোভাবে ঘুরতে পারবে না। সবসময় সামনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বৃত্ত ঘুরে আসতে হবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে।

শিক্ষকের করণীয়

– রুমাল চোর নির্বাচন করতে সহায়তা করবেন।
– খেলা কীভাবে করতে হবে তা দেখিয়ে দেবেন।
– খেলা পরিচালনা করবেন।

শিক্ষণীয় বিষয়

– ব্যবসায় করার সময় সামনে পিছনে, ডানে বামে, সবদিকে লক্ষ রেখে কীভাবে ব্যবসায় করতে হবে তা জানা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হচ্ছে–

ক. আত্মকর্মসংস্থান	খ. বেসরকারি খাত
গ. সরকারি খাত	ঘ. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

২. সর্বোচ্চ তিন কোটি টাকা বিনিয়োগকৃত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় –

i. ক্ষুদ্র ব্যবসায়
ii. ক্ষুদ্র শিল্প
iii. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও]

মিসেস কণা, চাল, ডাল, তেল, লবণ প্রভৃতি দ্রব্য নিকটস্থ পাইকারি দোকান থেকে ক্রয় করে বিক্রি করেন। পাইকারি দোকানের মালিক এসব দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্রয় করেন।

৩. **মিসেস কণা কোন ধরনের ব্যবসায়ী?**

ক. খুচরা খ. পাইকারি
গ. উৎপাদনকারী ঘ. খুচরা ও পাইকারি

৪. **উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের ব্যবসায়ের আওতায় পড়ে ?**

ক. আমদানি ব্যবসায় খ. উৎপাদনকারী ব্যবসায়
গ. পাইকারি ব্যবসায় ঘ. ক্ষুদ্র ব্যবসায়

সৃজনশীল প্রশ্ন

কাকলী একজন শিক্ষিত বেকার। বহু ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি না পেয়ে সে আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে সে আত্মকর্মসংস্থান ভিত্তিক অনেকগুলো প্রকল্পের সম্ভাব্যতা, প্রতিবন্ধকতা ও লাভের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে মৎস্য চাষ ও মৎস্য খামারের চারপাশে ফুল চাষ করার সিদ্ধান্ত নেয়। উক্ত পেশায় সফল হয়ে পরবর্তীতে সে আরও বড় আকারের মৎস্য চাষ এবং ফুলের চাষ করেন। ফলে এলাকার কিছু বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী ?

খ. কাকলীর আত্মকর্মী হওয়ার কারণ বর্ণনা কর।

গ. আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে তুমি কীভাবে অগ্রসর হবে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের শিক্ষিত বেকারদের বেকারত্ব লাঘবে আত্মকর্মসংস্থানের অবদান বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায় ৩

ব্যবসায় প্রকল্প নির্বাচন

অধ্যায় সূচি

১. প্রকল্প কী?
২. প্রকল্প চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া
৩. প্রকল্প ধারণা উন্নয়নের দিকনির্দেশনা
৪. প্রকল্প ধারণার উৎস
৫. পণ্য নির্বাচন
৬. প্রকল্প নির্বাচন
৭. সামষ্টিক নির্বাচন
৮. ব্যস্টিক নির্বাচন

প্রকল্প কী

ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশ নির্ভর করে ব্যবসায় বা উৎপাদনের জন্য পণ্য বা সেবা প্রদানের সামগ্রী নির্বাচনের উপর। চাহিদা আছে এবং চাহিদা ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাবে এমন পণ্য বা সেবা/সামগ্রী চিহ্নিত করে একটি বাস্তবসম্মত প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারলে ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকটা নিশ্চিত হয়। এ কাজে দুর্বলতা থাকলে সাফল্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং সীমিত হয়ে যায়। তাই ব্যবসায়ের সাফল্যের পূর্বশর্ত সার্থক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং একটি সুষ্ঠু প্রকল্প প্রণয়ন। এ অধ্যায়ে প্রকল্প কী, প্রকল্পের জন্য সঠিক পণ্য বা সেবা কীভাবে নিরূপণ করা যায় এবং প্রকল্পের যথার্থতা কীভাবে যাচাই করা যায় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে মূলধন বিনিয়োগের প্রস্তাবই একটি প্রকল্প। এটা প্রত্যাশিত পণ্য সৃষ্টির জন্য কতগুলো প্রয়োজনীয় উপকরণের সমষ্টি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনাব কামরুল হাসান, দুধ, মাখন ও পনির প্রভৃতি পণ্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা: ভূমি, কারখানা বিল্ডিং তৈরি, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় মেটানোর জন্য চার লক্ষ টাকার একটি বিনিয়োগ প্রস্তাব প্রণয়ন করেছেন– এটাই তাঁর প্রকল্প। একটি প্রকল্প সম্পূর্ণ নতুন বিনিয়োগ অথবা পুরাতন কারখানার সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণ বা পুরাতন মেশিনের স্থলে নতুন মেশিন স্থাপন সংক্রান্ত হতে পারে।

প্রকল্প চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া

প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচনের সূচনা হয় প্রকল্প ধারণা অনুভব করা থেকে। সৃজনশীলতা প্রকল্প ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। প্রকল্প একজন শিল্পোদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীর নিছক কল্পনা হতে পারে অথবা পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করা থেকেও সৃষ্টি হতে পারে। ধারণাসমূহ সুযোগে পরিণত হয় যখন সেগুলোকে বাস্তবসম্মত প্রকল্প হিসেবে রূপ দেয়া যায়। একজন ব্যবসায়ীর সৃষ্টিশীলতা শুরু হয় বাজারজাতকরণযোগ্য কোনো পণ্যের ব্যবসায়িক চাহিদা সনাক্তরকরণের মাধ্যমে। কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা থেকে চাহিদার সৃষ্টি। মানুষের এ চাহিদা পরিবর্তনশীল। নিম্নের কতগুলো বিষয় থেকে পরিবর্তনশীল চাহিদার ধারণা মিলতে পারে। ১. অর্থনীতির অবস্থা ২. মানুষের চাহিদার প্রকৃতি ৩. জনসংখ্যার হার ৪. গবেষণালব্ধ তথ্য সচেতনা থেকে পরিবর্তনশীল চাহিদাগুলোর আগাম ধারণা পাওয়া যায় যা নতুন ধারণা জন্ম দিতে পারে।

প্রকল্প ধারণা উন্নয়নের দিক নির্দেশনা

প্রকল্প সংক্রান্ত ধারণা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতকগুলো নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে। এগুলো নিচে উল্লেখ করা হল:

১। নিজের শখ বা আগ্রহ আছে এমন বিষয় থেকে ব্যবসায়ের ধারণা করা।

২। কোনো একটি জিনিসের অভাব অনুভব করলে “এখানে কেন পাওয়া যায় না”– প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা।

৩। অপরের উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবাসমূহের অসুবিধাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা এবং সেগুলো থেকে নতুন ধারণা নেয়া।

৪। সাধারণ জিনিসের বিশেষ ব্যবহার খুঁজে বের করা।

৫। পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক ব্যবহারের সুযোগ থেকে ব্যবসায়ের ধারণা সৃষ্টি করা।

৬। নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের সুযোগ থেকে ব্যবসায়ের ধারণা সৃষ্টি করা।
৭। বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ করার ব্যাপারে চিন্তা করা।
৮। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পণ্য মিশ্রণের বা নতুন পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট থাকা।

প্রকল্প ধারণার উৎস

নিচের এক বা একাধিক উৎস থেকে প্রকল্প ধারণা পাওয়া যেতে পারে :

১। উৎপাদন ও ব্যবসায় তথ্য : আমদানি, রপ্তানি, বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ও তার ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান। আমদানি এবং রপ্তানি, বিভিন্ন শিল্পের লাভজনক তথ্য, বর্তমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার, বহু বিভাজনের সম্ভাব্যতা, ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিংকেজ ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নতুন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা নির্দেশ করতে পারে।

২। দাম তথ্য : উৎপাদিত দ্রব্যের দাম সংক্রান্ত তথ্য কোনো উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বিরামহীন বৃদ্ধির প্রধান কারণ হতে পারে যে ঐ দ্রব্যের যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ বেশি।

৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথ্য : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন গবেষণা নতুন পণ্যের আবির্ভাব কিংবা চলতি পণ্য আরও কম খরচে উৎপাদনের জন্য নতুন প্রযুক্তি, নতুন প্রকল্প ধারণার সুযোগ সৃষ্টির দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

৪। জরিপ : নির্দিষ্ট অঞ্চলের শিল্পের সম্ভাব্যতা জরিপ করা কোনো এলাকার শিল্প উন্নয়নের সম্ভাব্যতা জরিপ, প্রকল্প শনাক্তকরণের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে।

৫। ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান : উন্নয়ন ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রকল্প সংক্রান্ত ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

৬। বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদি : বাণিজ্য সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা প্রকল্প সংক্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত নীতিসমূহ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনাসমূহ, বাণিজ্য ও শিল্প সংস্থাগুলোর প্রকাশনাসমূহ, বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা পরিচালিত জরিপ ও গবেষণালব্ধ তথ্য, প্রকল্প ধারণার উৎস হতে পারে। শিল্প মন্ত্রণালয় ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতি দেশের শিল্পায়নের উদ্দেশ্য ও রূপরেখা বাস্তবায়নের কৌশল ব্যাখ্যা সম্পর্কিত একটি দিকনির্দেশনামূলক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। শিল্প নীতিতে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাদের কী কী সুযোগ–সুবিধা প্রদান করা হয় এবং কোন কোন খাতে শিল্প স্থাপন প্রয়োজন সে বিষয়ে উল্লেখ থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, দেশের শিল্প–বাণিজ্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় আয়, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রকল্প ধারণা নির্বাচনে পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করে।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রকল্প উদ্যোক্তা উপরিউক্ত উৎস থেকে সম্ভাব্য প্রকল্পের পণ্য সম্পর্কে ধারণা পাবে। পণ্য নির্বাচন প্রকল্প চিহ্নিতকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

পণ্য নির্বাচন

সঠিক পণ্য নির্বাচনের উপরই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে। বাজার জরিপের মাধ্যমে একজন উদ্যোক্তা সঠিক পণ্য নির্বাচন করতে পারে। বাজার জরিপ বলতে ভোক্তার বা গ্রাহকের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে পণ্যের চাহিদা এবং তা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরির সম্ভাব্যতা যাচাইকে বুঝায়। বাজার জরিপের মাধ্যমে একজন শিল্পোদ্যোক্তা নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে পারে।

১। বাজারের আকার কী?
২। চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে যোগানের উৎসসমূহ কী কী? কোথায় এবং কীভাবে তা উৎপাদিত হচ্ছে?
৩। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের মোড়ক কি খুব গুরুত্বপূর্ণ?
৪। কীভাবে পণ্য ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে?
৫। ভবিষ্যতে চাহিদা বাড়বে কিনা?

৬। কাঁচামালের যোগানের বর্তমান উৎস কী? কাঁচামালের সরবরাহ কতটুকু স্থিতিশীল?
৭। বর্তমান মূল্যে কাঁচামালের সরবরাহ অব্যাহত থাকবে কিনা?
৮। বাজার চাহিদার কত অংশ আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে?

প্রকল্প নির্বাচন

পণ্য নির্বাচনের পর উদ্যোক্তা সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে। এ তালিকা থেকে সামষ্টিক নির্বাচন (Macro-screening)-এর মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত প্রকল্প তালিকা তৈরি করবে। সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে মাইক্রোস্ক্রিনিং এর মাধ্যমে একটি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করবে। ব্যাষ্টিক নির্বাচন (Micro-screening) ও সামষ্টিক নির্বাচন (Macro-screening) –এর ছক সংযুক্ত অনুশীলনীতে দেয়া হল।

সামষ্টিক নির্বাচন

(Macro-screening)

সকল ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি উদ্যোক্তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কতিপয় সাধারণ বা সামগ্রিক উপাদান দ্বারা কম বেশি প্রভাবিত। এসব উপাদানের সমষ্টিকে একত্রে সামষ্টিক বা ম্যাক্রো পরিবেশ বলে। ম্যাক্রো পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে জনসংখ্যা বিষয়ক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত। ম্যাক্রোস্ক্রিনিং হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন প্রকল্পের উপর এসব উপাদানের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া যাচাই করা যায়। ম্যাক্রো পরিবেশের প্রভাবগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

ক. জনসংখ্যা বিষয়ক

একটি ব্যবসায় কত ভালোভাবে চলবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে ঐ দেশের বা ঐ বাজার এলাকার জনগোষ্ঠীর উপর। জনগোষ্ঠীর প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যার ঘনত্ব, বয়সভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ, জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহের হারের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে ঐ ব্যবসায়। কাজেই যে ব্যবসায়ের ধরণটা বেছে নেয়া হবে, দেখতে হবে ঐ পণ্যের ভোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না কমে যাচ্ছে। ভোক্তাদের জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিঙ্গার সেলাই কল যখন প্রথমে বাজারে এসেছিল, এর প্রস্তুতকারকরা ভেবে নিয়েছিলেন মহিলারা শুধু গৃহবধূ থাকবে এবং ঘরে বসে সেলাই কাজ করবে। কিন্তু বর্তমানে মহিলাদের কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর ঘরে বসে সেলাই করার সময় এবং উপযোগিতা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। সুতরাং জনগোষ্ঠী ভবিষ্যতে কী ধরনের বিরূপ আচরণ করবে তা প্রকল্প বাছাইয়ের সময় বিবেচনা করতে হবে।

খ. অর্থনৈতিক পরিবেশ

একটি এলাকার অর্থনৈতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে ঐ এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমান ও ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা নিরূপণ করতে হবে। প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অর্থনৈতিক উপাদান বিবেচনা করতে হয় সেগুলো হচ্ছে :

ভোক্তার আয় : ভোক্তাদের আয়ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস করা যায়। যথা– উচ্চ, মধ্যম, নিম্ন। প্রকল্পগুলো কোন শ্রেণীর জন্য টার্গেট করা হচ্ছে এবং তার পরিমাণ কত সেটা বিবেচনার বিষয়।

খরচ করার প্রবণতা : মানুষের মৌলিক চাহিদা হচ্ছে মোটামুটিভাবে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান। এখন নির্দিষ্ট বাজার এলাকায় দেখতে হবে ভোক্তারা তাদের আয় কোন চাহিদা মেটাতে বেশি ব্যয় করে? মধ্যবিত্ত সমাজে দেখা যায় যে, খাদ্য ক্রয়ের জন্যই বেশির ভাগ অর্থ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যে এলাকার মানুষের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে সে এলাকায় গৃহস্থালি আরাম আয়েশের জন্য অধিক ব্যয় করা হচ্ছে। কাজেই সঠিক ব্যবসায় বাছাইয়ের জন্য ভোক্তাদের খরচ করার ধরনটি লক্ষ রাখতে হবে।

জীবন নির্বাহের খরচ : অনেক পণ্য আছে যা মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু সামগ্রিক আয় ব্যবস্থা জীবন নির্বাহের মান ইত্যাদি বিবেচনা করে তা ক্রয় করতে পারছে না। চাহিদা আছে কিন্তু ক্রয়সীমার মধ্যে নয় তা সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুতকারীকেই বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হয়। যেমন– বাংলাদেশে মিনি শ্যাম্পু, মিনি টুথপেস্টের প্রচলন হয়েছে।

বাংলাদেশের মতো গরিব দেশের গ্রামের মেয়েরা শ্যাম্পু ব্যবহার করবে– এ ধরনের প্রকল্প প্রথম দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য হলেও এর প্রস্তুতকারকরা বুদ্ধি করে মিনি প্যাকেট করাতে শ্যাম্পু ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং প্রকল্প বাছাইয়ের সময় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বর্তমানে কী এবং ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

গ. প্রাকৃতিক পরিবেশ

সঠিক ব্যবসায় বাছাইয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আসে। বিশ্বজুড়ে আজ পরিবেশ দূষণের যে প্রতিবাদ জেগে উঠেছে তার ফলে আজ মানুষ জানতে পারছে যে কোন ধরনের শিল্প কারখানা পরিবেশ দূষণ করছে। এ ধরনের শিল্প কারখানা সামাজিকভাবে পরিত্যাজ্য।

ঘ. রাজনৈতিক পরিবেশ

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দর্শন, রাজনীতিবিদদের আচরণ প্রভৃতি ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

ঙ. সাংস্কৃতিক পরিবেশ

শিক্ষার হার, কারিগরি শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুভূতি প্রভৃতি ব্যবসার কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে।

চ. আইনগত পরিবেশ

ব্যবসায়-বাণিজ্য সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আইনগত কাঠামো, আইনের যথার্থ প্রয়োগ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা প্রভৃতি ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে।

ব্যাষ্টিক নির্বাচন (Micro-screening)

মাইক্রোস্ক্রিনিং হল একটি প্রকল্পের যথার্থতা কারিগরি, বাজারজাতকরণ, বাণিজ্যিক ও আর্থিক দিক থেকে পরীক্ষা করা। নিচে মাইক্রোস্ক্রিনিং এর উপাদানগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

ক. কারিগরি দিক

প্রকল্পের কারিগরি দিক যাচাই করা হয় প্রযুক্তিগত ও যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এ ধরণনের কাজের মধ্যে রয়েছে উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি নির্বাচন, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রাপ্যতা, দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতা, প্রকল্প বাস্তবায়নে সহজসাধ্যতা প্রভৃতি পরীক্ষা করা।

খ. বাজারজাতকরণের দিক

উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা না থাকলে কোনো প্রকল্পই সফল হয় না। বাজার জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে কোনো পণ্যের চাহিদা আছে কীনা, বাজারে প্রতিযোগীদের সংখ্যা, আলোচ্য পণ্য বিতরণের সুযোগ–সুবিধা প্রভৃতি যাচাই করা হয়।

গ. বাণিজ্যিক দিক

প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পের বাণিজ্যিক লাভজনকতা নির্ধারণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ জাতীয় সম্ভাব্যতা যাচাইকালে উৎপাদন খরচের বিভিন্ন উপাদান, বিক্রয় মূল্য, আনুমানিক লাভ ইত্যাদি বিষয়সমূহ খুব সতর্কতার সাথে নির্ধারণ করতে হয়।

ঘ. আর্থিক দিক

প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্পের ব্যয় নিরূপণ, অর্থায়নের উপায়, মূলধন ব্যয়, বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার হার ইত্যাদি যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে হয়।

অধিকন্তু জাতীয় অর্থনীতিতে প্রকল্পটি কী অবদান রাখবে তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অর্থনীতিতে অবদান যাচাই করার মাপকাঠি হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদির পরিমাণ নির্ধারণ।

উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে যে প্রকল্পটি সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও লাভজনক তা বিনিয়োগের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

অনুশীলন

প্রকল্প ধারণা চিহ্নিতকরণ ও প্রকল্প নির্বাচন

ধাপ ১ : শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করা হবে।

ধাপ ২ : প্রতিটি দলে লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর একটি ছবি যেমন–বাংলাদেশের একটি শিশু বা কিশোর–কিশোরী বা যুবক–যুবতী বা বৃদ্ধ–বৃদ্ধার ছবি বিতরণ করতে হবে।

ধাপ ৩ : প্রতিটি দলকে তাদের লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর চাহিদার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হবে। শিক্ষার্থীদের বলে দেয়া হবে যে চাহিদা হচ্ছে কোন জিনিস পাওয়া ইচ্ছার পশ্চাতে অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য।

ধাপ ৪ : প্রতিটি দল তাদের লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর চাহিদা উপস্থাপন করবে (বড় সাদা কাগজে) ও শিক্ষক তা বিশ্লেষণ করবেন।

ধাপ ৫ : প্রতিটি দল তাদের লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী মস্তিষ্ক ঝড় (Brain Storming) করে ৮/১০টি ব্যবসায় চিহ্নিত করবে ও নিচে উল্লিখিত ছক অনুযায়ী ধারণা বাছাই করবে।

ধাপ ৬ : ব্যবসায়ের ধারণা বাছাইকরণ মস্তিষ্ক ঝড় (Brain Storming) অনুশীলন থেকে যেসব ধারণা পাওয়া গেছে সেগুলো থেকে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করার একটি পদ্ধতি হল ম্যাক্রো স্ক্রিনিং এবং মাইক্রোস্ক্রিনিং। ধারণাগুলোকে নিচে উল্লিখিত ম্যাক্রো স্ক্রিনিং ছক অনুযায়ী সাজাতে হবে এবং মানদণ্ড অনুযায়ী প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মান বসাতে হবে। মান বসানো শেষ হলে যে প্রকল্পগুলো সর্বোচ্চ মান লাভ করবে সে প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হবে। সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন ন্যূনতম ৫টি প্রকল্প গ্রহণ করে তা আবার মাইক্রোস্ক্রিনিং করা হবে।

ধাপ ৭ : মাইক্রোস্ক্রিনিং করার পরে সর্বোচ্চ মান সম্পন্ন প্রকল্পটিকে নির্বাচন করা হবে।

ম্যাক্রো স্ক্রিনিং ছক

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম		ম্যাক্রো প্রভাবসমূহ					
নং		জনসংখ্যা	অর্থনৈতিক	প্রাকৃতিক	রাজনৈতিক	সাংস্কৃতিক	আইনগত	মোট
১ ২ ৩ ৪ ৫								

মানদণ্ড :

৫–অতি উত্তম, ৪–অত্যন্ত সন্তোষজনক, ৩–সন্তোষজনক, ২–ভালো, ১–অসন্তোষজনক

মাইক্রো স্ক্রিনিং ফর্ম্যাট

কোম্পানির নাম...

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	উৎপাদনসমূহ											
		পণ্যের চাহিদা	প্রতিযোগী–দের সংখ্যা	কাঁচামালের প্রাপ্যতা	বিতরণের সুবিধা	দক্ষ শ্রমিক প্রাপ্যতা	প্রযুক্তির সরলতা	সহজ প্রকল্প বাস্তবায়ন	ঝুঁকি	প্রকল্পের সাথে সংগতিপূর্ণ মূলধন	আনুমানিক লাভ	মোট	সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান
১													
২													
৩													
৪													
৫													
৬													
৭													
৮													
৯													
১০													

মানদণ্ড:

৫– অতি উত্তম
৪– অত্যন্ত সন্তোষজনক
৩– সন্তোষজনক
২– ভালো
১– অসন্তোষজনক

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাজার জরিপ করা হয় কেন ?

ক. সঠিক পণ্য নির্বাচনে
খ. পণ্যের তালিকা প্রণয়নে
গ. জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ে
ঘ. ভোক্তার আচরণ নির্ণয়ে

২. বাজারে পণ্য নির্বাচনে উদ্যোক্তার জানা প্রয়োজন –

i. বাজারের আকার
ii. চাহিদার পরিবর্তন
iii. ক্রেতার নিকট পণ্য পৌঁছানোর পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও]

জনাব করিম তার মুদি ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে অনেক ব্যবসায়ী বন্ধুদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি পরামর্শ অনুযায়ী কাঁচামালের উৎস এবং কোথায় উৎপাদিত হয় এবং পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে ব্যবসার জন্য পণ্য নির্বাচন ও ব্যবসায় পরিচালনা করেন।

৩. জনাব করিম কর্তৃক কাঁচামালের উৎসের খোঁজ–খবর নেওয়ার কাজটি হচ্ছে–

ক. বাজার জরিপ
খ. পণ্য নির্বাচন
গ. প্রকল্প নির্বাচন
ঘ. প্রকল্প প্রণয়ন

৪. জনাব করিম কীভাবে সঠিক পণ্যের নির্বাচন করতে পারেন ?

ক. বাজার দাম বিবেচনা করে
খ. পণ্যের গুণাগুণ বিবেচনা করে
গ. পণ্যের চাহিদা বিশ্লেষণ করে
ঘ. বাজার জরিপের মাধ্যমে

সৃজনশীল প্রশ্ন

রবি একজন শিক্ষিত বেকার। তিনি একটি ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন করতে চাচ্ছেন। তিনি অপরের উৎপন্ন দ্রব্যের অসুবিধাগুলো পর্যবেক্ষণ, সঠিক জিনিসের বিশেষ ব্যবহার অনুসন্ধান, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা, অসুবিধা, পণ্য মিশ্রণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকগুলো বিবেচনা করে পণ্য নির্বাচন করেন।

ক. বাজার জরিপ কী ?

খ. প্রকল্প চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

গ. প্রকল্প সংক্রান্ত ধারণা উন্নয়নের জন্য রবি যেসব নিয়ম অনুসরণ করবেন তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “সঠিক পণ্য নির্বাচন ব্যবসায় সফলতা বয়ে আনে” এর পক্ষে যুক্তি দাও।

অধ্যায় ৪

সহায়তার ধরন ও উৎসসমূহ

অধ্যায় সূচি

১. উদ্দীপনামূলক সহায়তা
২. সমর্থনমূলক সহায়তা
৩. সংরক্ষণমূলক সহায়তা
৪. সহায়তার উৎসসমূহ
(ক) সরকারি সহায়তা
(খ) বেসরকারি সহায়তা

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে অনেক ধরনের সহায়তার প্রয়োজন। এসব সহায়তা একজন সম্ভাবনাময় ব্যক্তিকে শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনা করতে অনুপ্রাণিত করে। ধরন অনুযায়ী এসব সহায়তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (১) উদ্দীপনামূলক সহায়তা (২) সমর্থনমূলক সহায়তা (৩) সংরক্ষণমূলক সহায়তা।

১. উদ্দীপনামূলক সহায়তা

শিল্প স্থাপন একটি সৃজনশীল, গঠনমূলক কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। সহজে এ কাজে কেউ এগিয়ে আসতে চায় না। এ জন্য প্রয়োজন হয় উদ্দীপনামূলক সহায়তা। এ সহায়তা হল কোনো ব্যক্তিকে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। কারো অধীনে চাকরি করার চেয়ে নিজেই নিজের ও অন্যের জন্য কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা যে সবদিক থেকে ভালো এ কথাটি কাউকে ভালোভাবে বুঝাতে পারলে সে হয়তো শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে উৎসাহিত হবে। এ ধরনের সহায়তার মধ্যে পড়ে : ১. উদ্যোগ গ্রহণমূলক শিক্ষা ২. অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ ৩. বিনিয়োগ সুযোগ সুবিধা ৪. শিল্প স্থাপনে সরকারি সাহায্য সহায়তার ব্যাপক প্রচার ৫. পণ্য নির্বাচন ৬. প্রকল্প প্রণয়নে সাহায্য ৭. পরামর্শ দান ৮. কারিগরি ও অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এসব কার্যাবলির মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে বা শিক্ষার্থীকে নতুন শিল্প উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়।

২. সমর্থনমূলক সহায়তা

শিল্প ও ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী কোনো ব্যক্তিকে তার আশা বাস্তবায়িত করার জন্য সমর্থনমূলক সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এসব সাহায্য তাকে শিল্প স্থাপন, পরিচালনা ও সম্পদের ব্যবহার ও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ–সুবিধা পেতে সাহায্য করে। উল্লেখযোগ্য সমর্থনমূলক সহায়তাগুলো হল–১. শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধীকরণ ২. মূলধন সংস্থান ৩. অবকাঠামোগত সহায়তা ৪. মেশিনারি নির্বাচন ও সংগ্রহে সাহায্য ৫. কাঁচামাল সরবরাহ ৬. সাধারণ সুযোগ সুবিধা প্রদান ৭. কর অবকাশ ৮. ভর্তুকি প্রদান ৯. ব্যবস্থাপনার পরামর্শ প্রদান এবং ১০. পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা।

৩. সংরক্ষণমূলক সহায়তা

এ ধরনের সাহায্য একজন ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ে টিকে থাকতে সাহায্য করে। শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনের পরও একজন উদ্যোক্তা উৎপাদন কার্য অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে নানারকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। সংরক্ষণমূলক সাহায্য সহায়তার অন্তর্ভুক্ত উপাদান হল : ১. ব্যবসায় আধুনিকীকরণ ২. সম্প্রসারণ ৩. পণ্য বাজারজাতকরণ ৪. উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত অর্থসংস্থান ৫. ঋণ ও সুদ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি ৬. শিল্প সম্প্রসারণের পরামর্শ ৭. আইন অনুযায়ী স্বীকৃতি ৮. সাধারণ সুবিধাদি প্রদানের কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি।

সহায়তার উৎসসমূহ

উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের সহায়তা বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যেতে পারে। উৎসগুলোকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের উৎস হিসেবে ভাগ করা যায়।

১. সরকারি সহায়তা

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে সরকারি উৎসসমূহই শিল্পোদ্যোগ সহায়তার মূল উৎস হিসেবে পরিগণিত। কারণ দ্রুত শিল্পায়ন সরকারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অন্যতম অংশ। সরকার দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতিমালা যেমন : ১. শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি ২. রাজস্ব নীতি ৩. আমদানি–রপ্তানি নীতি ৪. বিভিন্ন অবকাঠামোগত সুবিধা দানের নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন করেন। শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ–সুবিধা প্রদান করে থাকেন।

ক. শিল্প নীতি

সরকার শিল্প স্থাপনে নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আনার জন্য শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি ঘোষণার মাধ্যমে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার দিক–নির্দেশ করে থাকে। শিল্পায়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য অবস্থার আলোকে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সময় সময় শিল্পনীতির সংশোধন ও পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করা হয়। একটি সুষ্ঠু শিল্পনীতি উদ্যোক্তাদেরকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের জুন মাসে সর্বপ্রথম “নতুন শিল্পনীতি” (New Industrial Policy) ঘোষিত হয়। এ শিল্পনীতির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা। জাতীয় প্রয়োজনে শিল্প নীতি বিভিন্ন সময় সংশোধিত ও পরিবর্তত হয়।

খ. শিল্প স্থাপনে সরকারি উৎসাহ দান

দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য সরকার যেসব সুযোগ–সুবিধা প্রদান করে থাকে তার উল্লেখযোগ্য সুবিধাদি নিচে উল্লেখ করা হল :

শিল্পোন্নয়নের সুষম বিকাশের সরকারি নীতি অনুযায়ী সমগ্র দেশকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে :

উন্নত এলাকা : যেখানে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান এবং যথেষ্ট শিল্পায়ন ঘটেছে।

স্বল্পোন্নত এলাকা : যেখানে আংশিক অবকাঠামোর বিকাশ ঘটেছে এবং কিছু শিল্পায়ন হয়েছে।

অনুন্নত এলাকা : যেখানে কোন প্রকার অবকাঠামোর বিকাশ ঘটেনি অথবা কোন শিল্পায়ন হয়নি।

গ. রাজস্ব সুবিধা

কর অবকাশ : উন্নত, স্বল্পোন্নত এবং অনুন্নত এলাকায় শিল্প স্থাপন করা হলে যথাক্রমে পাঁচ বছর, সাত বছর এবং নয় বছরের কর অবকাশ থাকবে। এরূপ অবকাশের মেয়াদ বাণিজ্যিক উৎপাদনের শুরুর মাস থেকে গণনা করা হবে। এছাড়া মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগির খামার, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ উৎপাদন, উদ্যান পালন প্রভৃতি শিল্পে এলাকা নির্বিশেষে দশ বছরের কর অবকাশ দেয়া হয়েছে।

বর্ধিত হারে অবচয় ধার্যের সুযোগ : নতুন মেশিনারি বা প্ল্যান্টের বেলায় ১ম বছরে শতকরা ৮০ ভাগ এবং পরবর্তী বছরে শতকরা ২০ ভাগ অবচয় ধার্য করার সুযোগ রয়েছে। স্বল্পোন্নত এলাকায় স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রে ১ম বছরে এই অবচয় হার শতকরা ১০০ ভাগ হতে পারে।

বিনিয়োগ ভাতা : কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মেশিনারি ও প্ল্যান্টের প্রকৃত মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ বিনিয়োগ ভাতা দেয়া হবে। অনুন্নত এলাকায় স্থাপিত শিল্পের জন্য এ ভাগ শতকরা ২৫ ভাগ।

লোকসান স্থানান্তর : কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি লোকসানের সম্মুখীন হয় তবে এক বছরের লোকসান পরবর্তী বছরে স্থানান্তর অথবা অন্য বছরের মুনাফার সাথে সমন্বয় সাধন করা যাবে।

করমুক্ত এলাকা : দালান, যন্ত্রপাতি ও প্ল্যান্ট বিক্রয় থেকে অর্জিত মূলধনী মুনাফা ২ বছরের মধ্যে সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা হলে অথবা নতুন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা হলে অথবা প্রতিষ্ঠানটিকে কোম্পানিতে রূপান্তরিত করলে ঐ মুনাফা করমুক্ত হবে।

দ্বৈত কর রেয়াত : বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে দ্বৈত কর রেয়াতের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লভ্যাংশ আয়, রয়্যালটি ও প্রযুক্তি ফী কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণের সুদ এবং আনুষঙ্গিক কিছু কিছু ব্যয় করমুক্ত রাখা হয়েছে।

ঘ. শিল্পের অর্থসংস্থান

দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য পুঁজির ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় মুদ্রার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পুঁজির অভাবে স্থানীয় মূলধনও কার্যকরভাবে শিল্পায়নে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। কারণ শিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় উপাদান, মেশিনারি ও প্ল্যান্ট এবং প্রযুক্তি প্রভৃতি বৈদেশিক মুদ্রায় সংগ্রহ করতে হয় সেজন্য সরকার দেশিয় উদ্যোক্তাদের শিল্পায়নে আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া স্থানীয় মুদ্রায় নতুন শিল্প গড়ে তোলা, প্রতিষ্ঠিত শিল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ইত্যাদি উদ্যোগমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

ঙ. শিল্পায়নে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

কোনো একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন সাফল্যজনকভাবে পরিচালনার জন্য শিল্পোদ্যোক্তার নানাবিধ সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এ সকল সাহায্য শিল্প চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে শিল্পের অব্যাহত সাফল্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, যারা শিল্পায়নে অব্যাহতভাবে সাহায্য–সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। একজন উদ্যোক্তা শিল্পায়নে সরকার প্রদত্ত লাভের প্রক্রিয়া জানার জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। নিচে শিল্পায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলি অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হল :

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসংস্থা (BSCIC)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থার প্রধান কাজ হলো এ শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের পূর্বে পরামর্শদান। এ সংস্থার অন্যান্য কর্মগুলো নিম্নরূপ : ১. শিল্প সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ২. উদ্যোক্তা শনাক্তকরণ ৩. সাহায্যমূলক সেবা ৪. শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন ৫. প্রকল্প নির্বাচন ৬. প্রকল্প মূল্যায়ন ৭. সম্ভাব্যতা পরীক্ষা ৮. ঋণ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান ৯. শিল্প ইউনিট অনুমোদন প্রকল্প বাস্তবায়ন ১০. অবকাঠামোগত উন্নয়ন ১১. ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন ১২. পণ্য ডিজাইন ১৩. প্রোটোটাইপ উন্নয়ন ও তার বিতরণ ১৪. কাঁচামাল সরবরাহের সাহায্য ১৫. উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর বিপণনে সহায়তা ১৬. উপঠিকাদারির ব্যবস্থা করা ১৭. গবেষণা ও উন্নয়ন ১৮. যথোপযুক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও মান নিয়ন্ত্রণ ১৯. পণ্যের বাজার সমীক্ষা ২০. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর প্রকাশনা প্রভৃতি। ক্ষেত্র বিশেষে এ সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করে থাকে। শিল্পোদ্যোক্তাদের কাছে সংস্থার সাহায্যসমূহ পৌঁছে দেয়ার জন্য সংস্থা দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (BSB)

বাংলাদেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করার উদ্দেশ্যে নতুন শিল্প প্রকল্প স্থাপন এবং চালু শিল্প প্রকল্পগুলোর সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি পরিবর্তন এবং সম্প্রসারণের জন্য শিল্প উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান ও পরামর্শ দেয়া শিল্প ব্যাংকের প্রধান কাজ।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রদান করে এবং ব্যাংকের সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য সীমিত পরিমাণে স্বল্প মেয়াদি চলতি মূলধন সরবরাহ করে। এ ছাড়া সীমিত পরিমাণে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিসমূহের শেয়ার সরাসরি ক্রয়ের মাধ্যমে ইকুইটি সমর্থন দান, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলোর শেয়ার সাধারণ্যে বিক্রয়ের জন্য অবলিখন (Underwriting) এবং এ ধরনের কোম্পানিগুলোর জন্য স্বল্প মেয়াদি সম্পূরক অর্থ যোগানের ব্যবস্থা করে। ব্যাংক বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক অন্যান্য সূত্র থেকে সংগৃহীত ঋণ

পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং প্রকল্প নির্বাচনে, বাস্তবায়নে ও পরিচালনায় বিনিয়োগকারীকে বিনামূল্যে কারিগরি পরামর্শ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (BSRS)

শিল্পক্ষেত্রে ঋণ দানের সুযোগ সৃষ্টি, শিল্প সম্পর্কিত সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার কার্যাবলি হচ্ছে নিম্নরূপ :

- ঋণ আদায়ের সামগ্রিক অবস্থা তথা ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্থার প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও যোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষজ্ঞমূলক ভূমিকার উন্নয়ন।
- সংস্থার নিজস্ব পোর্টফলিওভুক্ত শিল্প প্রকল্পগুলোর সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলোর অবলিখন/ব্রিজ ফাইন্যান্স/ডিবেঞ্চার ফাইন্যান্স প্রভৃতিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- অনাদায়ী কোম্পানিগুলোকে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য সংস্থার নিজস্ব সামর্থ্য ও যোগ্যতা বৃদ্ধিকরণ।
- নিজস্ব পোর্টফলিওভুক্ত শিল্প প্রকল্পের মধ্যে সমস্যাপীড়িত প্রকল্পসমূহের নিয়ন্ত্রণ, পুনর্বাসন ও পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং
- শিল্পায়ন, গবেষণা ও শিল্প সম্পর্কিত পরামর্শ দান।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB)

বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান, বিনিয়োগের সম্প্রসারণ, পুঁজি বাজার উন্নয়নে সাহায্য প্রদান, সঞ্চয়কে অর্থকরী কাজে লাগানো ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে এ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠার সময় হতেই আইসিবি সাধারণ সীমিত কোম্পানির বৈশিষ্ট্য অধিকারী প্রকল্পসমূহে অর্থনৈতিক সাহায্য, প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রকল্পের যৌক্তিকতা যাচাই ও বিনিয়োগের বিভিন্ন দিক নির্ধারণের প্রেক্ষিতে অবলিখন ও ঋণপত্র (Debenture) ঋণের যাচাই সহায়তা করে আসছে। আইসিবি এর কার্যাবলি সম্পাদনের সময় বাণিজ্যিক দিক ছাড়াও পুঁজির বাজার, বিনিয়োগকারী ও জনসাধারণের দিক বিবেচনা করে থাকে। বিনিয়োগ ঝুঁকি দূর করার জন্য আইসিবি'র নেতৃত্বে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

শিল্প ও ব্যবসায়ে উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা করার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক যথা– সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক দেশব্যাপী শাখা বিস্তারের মাধ্যমে সর্বস্তরের শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। তাছাড়া ব্যাংকিং সেবাকে আরও ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব ব্যাংক শিল্পোদ্যোক্তাদের স্বল্প মেয়াদি পুঁজির অভাব মেটাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো দীর্ঘমেয়াদি পুঁজিও সরবরাহ করছে। একজন শিল্পোদ্যোক্তা মূলধন ছাড়াও ব্যাংক থেকে শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত বিনিয়োগপূর্ব পরামর্শ, পণ্য নির্বাচন এবং বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ পেতে পারে।

আমদানি–রপ্তানি নিয়ন্ত্রক (CIE)

শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা করতে একজন উদ্যোক্তাকে মেশিনারি, কাঁচামাল এবং খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হয়। রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করার পূর্বে সরকারি অনুমোদন নিতে হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক বিদেশ থেকে দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করার লাইসেন্স এবং রপ্তানিকারককে রপ্তানি নিবন্ধন (Registretion) সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকে।

বাংলাদেশ হস্তচালিত তাঁতশিল্প দ্রব্য রপ্তানি কর্পোরেশন (BHPEC)

এ কর্পোরেশনের প্রধান লক্ষ্য হল হস্তচালিত তাঁত শিল্প দ্রব্যসমূহের রপ্তানি বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের তাঁত ও কুটির শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য এ কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে থাকে। সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে তাঁত শিল্প দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্য সংস্থা (BITAC)

দেশের শিল্পায়ান এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কেন্দ্রের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ দান, নতুন ডিজাইন ও যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত করা, যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে উপদেশ প্রদান, বিভিন্ন প্রকাশনা, সেমিনার, গ্রুপ আলোচনা, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তির জ্ঞান দান ইত্যাদি।

বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষা ইন্‌স্টিটিউট (BSTI)

এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হল বাংলাদেশের উৎপাদিত দ্রব্য দেশি ও বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতার সামর্থ্য অর্জনের জন্য উন্নতমানের দ্রব্য আমদানি ও উৎপাদনের প্রতি দৃষ্টি রাখা। এ লক্ষ্যে সকল উৎপাদনকারী যাতে মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলে, সংস্থা তার ব্যবস্থা করে থাকে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR)

এ পরিষদ শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার দিকনির্দেশ, নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও পরিষদের বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বাস্তব প্রয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে। এ ছাড়া এটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সেল স্থাপনে উৎসাহিত করে। দেশীয় প্রযুক্তি বা প্রক্রিয়া উন্নয়ন এবং শিল্প ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করাও পরিষদের অন্যতম কাজ। একজন শিল্পোদ্যোক্তা এ পরিষদের আবিষ্কৃত পণ্য বা প্রক্রিয়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করে উৎপাদন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

২. বেসরকারি সহায়তা

শিল্প স্থাপনের প্রেরণা বা সহায়তা বেসরকারি উৎস থেকেও পাওয়া যায়। একজন ব্যক্তিকে তার ব্যবসায়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক পর্যবেক্ষণ, পণ্যের চাহিদার ধরন, কোনো শিল্প উদ্যোক্তার সাথে মেলামেশার সুযোগ, সাহায্য দানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর সাথে পরিচয় বা হৃদ্যতা শিল্প/ব্যবসায়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। একজন উদ্যোক্তা বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ফার্ম, বেসরকারি সংস্থা (NGO), পরামর্শক (Consultant), ব্যবসায় সমিতি থেকে পরামর্শ নিতে বা অনুপ্রেরণা পেতে পারে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পুঁজি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ক্ষুদ্র শিল্পের বেলায় বেসরকারি উৎস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

ক. বন্ধু–বান্ধব আত্মীয়স্বজনের ঋণ

বন্ধু–বান্ধব ও আত্মীয়–স্বজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ বরাবর অর্থসংস্থানের একটি স্বীকৃত উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

খ. বেসরকারি সাহায্য সংস্থা

উদ্যোক্তা উন্নয়নে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সাহায্য সংস্থাগুলোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তবে এ সংস্থাগুলো মূলত গ্রামীণ বিত্তহীনদের উদ্যোগী হবার ব্যাপারে সাহায্য–সহযোগিতা করে থাকে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্থার কার্যক্রম বর্ণনা করা হচ্ছে।

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংক নামকরণের মাধ্যমে একটি গবেষণা কাজ হাতে নেন। পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে তা বিরাট মহীরূপে পরিণত হয়েছে। ১৯৮৩ সালের সেপটেম্বর মাসে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পকে বিত্তহীনদের জন্য একটি বিশেষ ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয়।

সাধারণত বিত্তহীনদের ৫ বা ১০ জনের একটি দলকে একত্র করে এ ব্যাংক কোন বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ দিয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল একজনকে পৃথকভাবে ঋণ দেয়া হয়ে থাকে। মাথাপিছু গড় ঋণ ২ থেকে ৩ হাজারের বেশি হয় না। ঋণের টাকা গ্রুপের সভ্যগণ সম্মিলিতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে লাভজনক ব্যবসায় বা ক্ষুদ্র শিল্পে খাটাতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান ছাড়াও গ্রুপের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধ করে।

ব্র্যাক (Bangladesh Rural Advancement Committee)

ব্র্যাক সর্ববৃহৎ বেসরকারি সাহায্য সংস্থা। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নিয়ে সংস্থাটি স্থাপিত হয়। কিন্তু এরপর থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্র জনগণকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত করছে।

উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক যে কার্যক্রমগুলো হাতে নিয়েছে সেগুলো হচ্ছে–

ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কার্যক্রম : এর মধ্যে রয়েছে কাপড় বুনন, হাঁস–মুরগি পালন, আসবাবপত্র, তৈল উৎপাদন, গুড়, দড়ি, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরি, ধান ভানা প্রভৃতি।

সহযোগী প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন : এ কর্মসূচির আওতায় ভূমিহীন লোকদেরকে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, বিপণন প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। যেমন, ইট তৈরি প্রকল্প।

উৎপাদন কেন্দ্র উন্নয়ন : আধুনিক ডিজাইন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পজাত সামগ্রীর মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়।

ঐতিহ্যগত কারুশিল্পের উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে সিল্ক, জামদানি, নকশিকাঁথা প্রভৃতি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ধরন অনুযায়ী সহায়তাকে ভাগ করা যায় –

ক. তিন ভাগে খ. চার ভাগে
গ. পাঁচ ভাগে ঘ. ছয় ভাগে

২. উদ্যোক্তার জন্য সংরক্ষণমূলক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত উৎপাদন হচ্ছে –

ক. পণ্য উৎপাদনে সরকারি ভর্তুকি প্রদান
খ. শিল্প স্থাপনে সরকারি সহায়তার ব্যাপক প্রচার
গ. কারিগরি ও অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা
ঘ. ঋণ ও সুদ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি

৩. শিল্প পণ্যের উৎপাদনকারী যাতে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলে তা তদারকি করে–

i. BCSIR
ii. BSTI
iii. BITAC

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

শিল্প প্রতিষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনার জন্য শিল্পোদ্যোক্তার নানাবিধ সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এ উদ্দেশ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিল্প পরিচালনায় সহায়তা করছে।

৪. কোন সংস্থা শিল্প গবেষণা ও শিল্প সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান করে ?

ক. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা
খ. বাংলাদেশ কুটির শিল্প সংস্থা
গ. বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা
ঘ. বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড

৫. দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান কোনটি ?

ক. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক
খ. বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা
গ. ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
ঘ. বিসিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায় স্থাপনে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সরকারি সাহায্য যেমন পাওয়া যায়, তেমনি বেসরকারি সাহায্যও পাওয়া যায়। বর্তমানে একজন উদ্যোক্তা বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ফার্ম, বেসরকারি সাহায্য সংস্থা ইত্যাদি থেকে পরামর্শ ও সাহায্য নিতে পারে। সরকার উদ্যোক্তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক উদ্যোক্তাদের ঋণদান ও পরামর্শ দিয়ে থাকে।

ক. ব্যবসায় সাহায্যের উৎসসমূহকে কয় ভাগে করা যায় ?

খ. শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সরকারি সাহায্য সহায়তার উদ্দেশ্য কী ?

গ. শিল্প স্থাপনে কোন কোন উৎস এবং সংস্থা থেকে অর্থ এবং সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে তা বর্ণনা কর।

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

অধ্যায় ৫

প্রকল্পের ধরন, ব্যয় নিরূপণ ও অর্থায়ন

অধ্যায় সূচি

১. ব্যবসার ধরন
২। ব্যবসায়ের আকার
৩। মূলধনের পরিমাণ নিরূপণ ও অর্থসংস্থান
৪। প্রকল্পের অর্থায়ন
৫। দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের উৎসসমূহ
৬। চলতি পুঁজির উৎসসমূহ
৭। ঋণের যথার্থ ব্যবহার (কেস/ইতিবৃত্ত)

ব্যবসায় প্রকল্পের ব্যয় ও অর্থায়ন এর আকার, ধরন ও মালিকানার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এ অধ্যায়ে আমরা প্রথমে ব্যবসার ধরন, আকার, মালিকানার প্রকৃতি এবং পরে প্রকল্প ব্যয় নিরূপণ ও অর্থায়ন সম্পর্কে আলোচনা করব।

ব্যবসার ধরন

যারা জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যবসায় করে তাদের কার্যাবলি লক্ষ করলে দেখা যায় যে সবাই একই ধরনের ব্যবসায়ে নিয়োজিত নয়। তাদের কেউ শুধু পণ্য কেনা-বেচা করে, কেউ দ্রব্য তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে, আবার কেউ গ্রাহকের কোন জিনিস মেরামত করে জীবিকা চালায়। সাধারণত ধরন অনুযায়ী ব্যবসায়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : কেনা-বেচা, সেবামূলক এবং উৎপাদনমূলক।

কেনা-বেচা : এ ধরনের ব্যবসায় উৎপাদিত পণ্য কিনে এনে ক্রেতার কাছে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে পণ্যের গুণ বা রূপ পরিবর্তন করা হয় না। এ ব্যবসার উদাহরণ হিসেবে মুদি দোকান, স্টেশনারি শপ, কাপড়ের দোকান, ফার্মেসি প্রভৃতি ব্যবসায়ের নাম করা যেতে পারে। কেনা-বেচা খুচরা ও পাইকারি উভয় প্রকারের হতে পারে।

সেবামূলক : যে ব্যবসায়ে পণ্য বা দ্রব্যের গুণ পরিবর্তন করে বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে আয় উপার্জন করা হয় তাকে সেবামূলক ব্যবসায় বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন টিভি মেকানিক একটি খারাপ টিভি সারিয়ে এর গুণগত পরিবর্তন করে সেবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক পায়। সেবা প্রদানের জন্য তার টুলস এবং যন্ত্রাংশ হিসেবে কাঁচামালের প্রয়োজন হতে পারে। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, পরিবহণ, ট্রাভেল, এজেন্সি, ফটো কপিয়ার ইত্যাদি সেবামূলক ব্যবসায়ের উদাহরণ।

উৎপাদনমূলক : এ ধরনের ব্যবসায়ে কাঁচামালকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপ পরিবর্তন করে উৎপাদিত পণ্য হিসেবে বিক্রয় করা হয়। যেমন, কাঠ থেকে চেয়ার টেবিল প্রস্তুত, প্লাস্টিক দানা থেকে বলপেন তৈরি, এম এস শিট থেকে আলমারি তৈরি, গম থেকে আটা তৈরি ইত্যাদি। অন্য কথায় এ ধরনের কার্যকলাপকে শিল্প বলা হয়।

ব্যবসায়ের আকার

ব্যবসায় অতি ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি এবং বৃহদাকারের হতে পারে। সাধারণ ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ বা কর্মচারির সংখ্যা দ্বারা এর আকার (Size) নির্ণয় করা হয়। নিচে ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় সংক্রান্ত কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল। মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের কোন পৃথক সংজ্ঞা নেই।

ক্ষুদ্র শিল্প : ক্ষুদ্র শিল্প বলতে উৎপাদন প্রক্রিয়া বা সেবামূলক কর্মতৎপরতায় নিয়োজিত এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়- যার মোট স্থায়ী বিনিয়োগ, জমির মূল্য, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ও স্থাপন ব্যয় এবং কর শুল্ক বাদে তিন কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

কুটির শিল্প : কুটির শিল্প বলতে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যা পরিবারের দ্বারা পূর্ণ অথবা খন্ডকালীন সময়ে উৎপাদন অথবা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এবং যার মোট বিনিয়োগ ব্যয় পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ : মাইক্রো শব্দের অর্থ অতি ক্ষুদ্র এবং এন্টারপ্রাইজ শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠান। যেসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আকারে খুবই ক্ষুদ্র এবং বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ খুবই কম সেসব প্রতিষ্ঠান মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ নামে

পরিচিত। বর্তমানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ স্কীমের আওতায় স্বল্প পরিমাণ ঋণ থেকে শুরু করে সর্বাধিক দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়ে থাকে।

ব্যবসায়ের সাংগঠনিক ধরন : ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে শিল্পোদ্যোক্তাকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো কী হবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ব্যবসায় সংগঠনের পাঁচটি আইনগত স্বীকৃত ধরন রয়েছে, যথা– এক মালিকানা, অংশীদারি, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং সমবায়। তবে ছোট ছোট ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিচের চারটি সংগঠনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

একমালিকানা ব্যবসায় : এ জাতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক হচ্ছেন একজন ব্যক্তি যিনি নিজে, অথবা পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় অথবা কিছু সংখ্যক কর্মচারির সাহায্যে ব্যবসায়ের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন নিজস্ব উৎস এবং ধার করে সরবরাহ করে থাকেন। সুতরাং ব্যবসায়ের সমুদয় লাভ ও ঝুঁকি মালিককেই ভোগ বহন করতে হয়।

এ ধরনের সংগঠনের প্রধান সুবিধা হচ্ছে : ১. গঠনের সহজসাধ্যতা ২. ন্যূনতম আইনগত আনুষ্ঠানিকতা ৩. ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ৪. দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার সুবিধা ৫. একাই সমস্ত মুনাফা ভোগ। অন্যদিকে এক মালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধা হচ্ছে : ১. অসীম দায় ২. এককভাবে সমস্ত ক্ষতি বহন ৩. পুঁজির স্বল্পতা ৪. পণ্য উৎপাদনে সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের দেশে একক মালিকানা সংগঠন জনপ্রিয়।

অংশীদারি ব্যবসায় : দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় স্থাপন করতে পারে। বাংলাদেশে ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারায় অংশীদারি ব্যবসায়ের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে– "কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি যার ফলে তারা সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজন দ্বারা পরিচালিত একটি ব্যবসায়ের মুনাফার অংশ ভাগ করার নিমিত্তে সম্মত হয়।" এ সংজ্ঞা থেকে এটা পরিষ্কার যে, কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় সৃষ্টি হয় এবং যারা এ ধরনের ব্যবসায় করে থাকেন তারা অংশীদার হিসেবে পরিচিত হন।

এ ব্যবসায়ের সুবিধাসমূহ হল : ১. সংগঠনের সহজসাধ্যতা ২. অধিক পুঁজির সমাবেশ ৩. সকল অংশীদার একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ ৪. ঝুঁকি বহন ব্যবসায় সম্প্রসারণের সম্ভাবনা ৫. লাভ–ক্ষতি সমভাবে বণ্টন প্রভৃতি।

অপরদিকে **এ ব্যবসায়ের অসুবিধার মধ্যে–** ১. অংশীদারদের সীমাহীন দায় ২. পরস্পরের মধ্যে আস্থাহীনতা ৩. সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় মতানৈক্য ৪. গোপনীয়তা ফাঁস প্রভৃতি। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও মূলধন, সম্প্রসারণ, দায় ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে অংশীদারি ব্যবসায় এক মালিকানা ব্যবসায়ের চেয়ে উত্তম।

যৌথ মূলধনী কোম্পানি : মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তি যৌথভাবে মূলধন সরবরাহ করে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে যৌথ মূলধনী কোম্পানি বলে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী এ ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত। এ ব্যবসায়ের সদস্যদের দায় সীমিত এবং ব্যবসায়টি কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকারী। যার ফলে এটি নিজ নামে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

যৌথ মূলধনী ব্যবসায় দু ধরনের হতে পারে। যেমন, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। যেসব ব্যবসায় বিপুল পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। ছোট বা মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠন অনেক সুবিধাজনক।

প্রাইভেট কোম্পানি

যে যৌথ মূলধনী কোম্পানির সদস্য সংখ্যা দু (২) জনের কম নয় এবং পঞ্চাশ (৫০) জনের বেশি হয় না সেসব ব্যবসায়কে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে। এসব কোম্পানির সদস্যগণ তাদের শেয়ার মালিকানা হস্তান্তর করতে এবং শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রি করে জনসাধারণের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন না। সদস্যগণ নিজেরাই ব্যবসার মূলধন যোগান দিয়ে থাকে এবং অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজনীয়তা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে মিটিয়ে থাকে। সাধারণ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মালিকানা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রাখার সুযোগ থাকে। ফলে এ ধরনের ব্যবসায় সংগঠন আমাদের দেশে জনপ্রিয়।

পাবলিক কোম্পানি

যে যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ে নিম্নতম সদস্য সংখ্যা সাত এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ও বিভাজনের উপর নির্ভরশীল, শেয়ার মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য এবং সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। এ জাতীয় কোম্পানি জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। আইনের চোখে এর অস্তিত্ব চিরন্তন। কয়েকজন প্রবর্তক এ ধরনের কোম্পানি গঠন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর নিবন্ধনের জন্য স্মারকলিপি (Memorandum of Association) এবং পরিমেল নিয়মাবলি (Articles of Association) প্রস্তুত করে যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন করতে হয়।

সমবায় সমিতি : কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের কল্যাণের লক্ষ্যে সমবায় আইন অনুযায়ী স্বেচ্ছায় যে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে। সাধারণত সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত স্বল্প আয় উপার্জনকারী লোকেরা এ ধরনের ব্যবসায় গঠন করে। এ ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য সদস্যদের কল্যাণ সাধন।

যে কোনো সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তা ব্যবসায় শুরু করার পূর্বে ব্যবসায়ের বিভিন্ন সাংগঠনিক সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে যে কোনো একটি ধরন নির্বাচন করতে পারেন। আগ্রহী শিল্পোদ্যোক্তাগণ ব্যবসায়ের গঠন প্রকৃতি এবং সুবিধা অসুবিধা, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর ব্যবসায় শিক্ষার উপর রচিত পাঠ্যপুস্তক পাঠ করলে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

মূলধনের পরিমাণ নিরূপণ ও অর্থ সংস্থান

ব্যবসায়ের ধরন ও আকার যাই হোক না কেন ব্যবসায় শুরু করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থ ছাড়া কোনো ব্যবসায় শুরু এবং পরিচালনা করা যায় না। অর্থকে তাই ব্যবসায়ের জীবনী শক্তি বলা হয়। সর্বমোট যে পরিমাণ অর্থ নিয়ে একটা ব্যবসায় শুরু করা হয় তাকে মূলধন বলে। মূলধন দুই রকম– স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন।

স্থায়ী মূলধন

মূলধনের যে অংশ কোনো স্থাবর সম্পত্তি বা সম্পদ ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। যেমন, ব্যবসায়ের জন্য জমি, দালান, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, গাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয় ও তৈরি। এসব সম্পদ ব্যবসায় শুরু করার সময় সংগ্রহ করা হয় এবং ব্যবসায়ের কাজে বার বার ব্যবহৃত হয়। উৎপাদনের কাঁচামালের ন্যায় একবার ব্যবহার করলেই এদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না।

আজকাল জমির দাম ও দালান নির্মাণ খরচ এতবেশি বেড়ে গেছে যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে জমি ক্রয় করে ঘর নির্মাণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ভাড়া করা ঘরে ব্যবসায় শুরু করা যায়। তবে কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্রে ভাড়া নিতে গেলে সেলামি দিতে হয় বিরাট অঙ্কের। ফলে স্থায়ী মূলধনের খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। ব্যবসায় যদি উৎপাদনমূলক হয় তবে যন্ত্রপাতি খাতেই মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ হয় অনেক বেশি। আজকাল ইজারা অর্থায়ন (Lease Financial) এর মাধ্যমে স্বল্প মূলধন বিনিয়োগ করে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা সম্ভব। যন্ত্রপাতি, পরিবহণ, স্থাপনা খরচ, উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত যাবতীয় মেশিন টুলস, মাপার যন্ত্রপাতি, কাজ করার টেবিল, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়, অফিস উপকরণাদি সংগ্রহ প্রভৃতি বাবদ স্থায়ী পুঁজি ব্যয় করা হয়। এসব স্থায়ী সম্পদ সংগ্রহ বাবদ কী পরিমাণ মূলধন ব্যয় করা হবে তা আগেই নির্ণয় করা উচিত। বিভিন্ন সরবরাহকারীদের কাছ থেকে এসব দ্রব্যের দরপত্র সংগ্রহ করে, গুণগত ও দামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সুলভ মূল্যের জিনিস ক্রয় করা প্রয়োজন। কারণ প্রয়োজনের তুলনায় যদি এসব খাতে বেশি পরিমাণ মূলধন ব্যয় হয় তাহলে তা ব্যবসায়ের মুনাফার হার কমিয়ে দেবে, যা ব্যবসায়ের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

চলতি মূলধন

ব্যবসার দৈনন্দিন কাজ বা যাবতীয় উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তাই চলতি মূলধন। সাধারণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিক্রি করার জন্য ক্রয় খরচ, কর্মচারিদের বেতন, পণ্য মজুদ প্রভৃতি বাবদ চলতি মূলধন ব্যবহৃত হয়। উৎপাদনমূলক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কাঁচামালের মূল্য, পরিবহণ খরচ, আধা–প্রস্তুতকৃত পণ্য, শ্রমিকদের মজুরি, জ্বালানি খরচ ইত্যাদি বহন করার জন্য চলতি মূলধনের প্রয়োজন। সেবামূলক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়। চলতি মূলধনের টাকা খরচ হয়ে যাবার পর যখন ফেরত

আসে তখন ক্রেতা পণ্য বা সেবার মূল্য প্রদান করে। সে টাকা দিয়েই আবার পরবর্তী সময়ে পণ্য তৈরির জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় চলতি মূলধনের পরিমাণ আগেই হিসাব করে নিতে হবে। প্রকল্প ব্যয় নিরূপণের একটি উদাহরণ দেয়া যাক। জনাব আবদুর রহিম একটি ছোট আকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ফার্ম প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন, যার উৎপাদন পণ্য হবে পাউরুটি (Bread)। ফার্মটি স্থাপন করতে তার স্থায়ী ও চলতি মূলধন বাবদ মোট প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ হবে দুই লক্ষ টাকা। নিচে খাতওয়ারি মূলধন ব্যয়ের হিসাব দেয়া হল।

স্থায়ী মূলধন

জমি (১৪০০ স্কোয়ার ফুট)	২৫,০০০/=
কারখানা ঘর (১৫ x ২০)	৫০,০০০/=
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫০,০০০/=
আনুষঙ্গিক খরচ	১৫,০০০/=
মোট =	১,৪০,০০০/=

চলতি পুঁজি

স্থানীয় কাঁচামাল (১ মাসের)	২০,০০০/=
মজুরি ও বেতন (১ মাসের)	২৫,০০০/=
প্যাকিং দ্রব্যাদি	৫,০০০/=
অন্যান্য নগদ খরচ	১০,০০০/=
মোট =	৬০,০০০/=

মোট প্রকল্প ব্যয়

স্থায়ী মূলধন	১,৪০,০০০/=
চলতি মূলধন	৬০,০০০/=
মোট =	২,০০,০০০/=

প্রকল্প অর্থসংস্থান

নিজস্ব তহবিল	৬০,০০০/=
বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে	৩০,০০০/=
ব্যাংক ঋণ	১,১০,০০০/=
মোট =	২,০০,০০০/=

প্রকল্পের অর্থায়ন

প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ করার পর শিল্পোদ্যোক্তার পরবর্তী কাজ হল এর অর্থায়নের ব্যবস্থা করা। যদি সম্পূর্ণ মূলধন নিজস্ব তহবিল থেকে দেয়া সম্ভব হয় তবে উত্তম, না হলে ধার করতে হবে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে। অর্থায়নের প্রকৃতি অনুযায়ী মূলধনকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন এবং স্বল্পমেয়াদি মূলধন হিসেবে ভাগ করা যায়। মূলধনের যে অংশ এক বছরের কম সময়ে পরিশোধযোগ্য নয় এবং যা ব্যবসায়ের স্থায়ী সম্পত্তি যথা ভূমি, দালান, যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ খরচ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি বলে। স্বল্প সময় বা এক বছরের কম সময়ের মধ্যে যে মূলধন পরিশোধযোগ্য এবং যা চলতি পুঁজি সংস্থানের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি মূলধন বলে।

দীর্ঘ মেয়াদি মূলধনের উৎসসমূহ

- **নিজস্ব তহবিল :** ব্যবসায়ের মালিক তার সঞ্চয়কৃত অর্থের দ্বারা দীর্ঘমেয়াদি অর্থের সংস্থান করে থাকে।
- **বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন :** মালিকের নিজস্ব তহবিল অপর্যাপ্ত হলে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে পারে।
- **বাণিজ্যিক ব্যাংক :** বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রধানত স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থান করলেও আজকাল বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সরবরাহ করে থাকে।
- **শিল্প ব্যাংক :** দেশের শিল্পায়নের জন্য শিল্প ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সরবরাহ করে।
- **ব্যবসায় সঞ্চিত তহবিল :** চলতি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিজস্ব সঞ্চিত তহবিল হতেও শিল্প ও বাণিজ্যের দীর্ঘ মেয়াদি অর্থসংস্থান করা হয়।
- **ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স** (BASIC) **:** ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ের দীর্ঘ মেয়াদি অর্থসংস্থানের অন্যতম উৎস হল ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স।

- **লিজিং কোম্পানি :** বর্তমানে লিজিং কোম্পানিগুলো শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজির সংস্থান করে থাকে।
- **অন্যান্য বিনিয়োগকারী সংস্থা :** বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, বেসকারি প্রতিষ্ঠান, যেমনঃ মাইডাস, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক, ক্ষুদ্র ও মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজি সরবরাহ করে থাকে।

এ ছাড়া মালিকের ব্যক্তিগত ঋণ, মেশিনারি সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ, সরকারি ঋণ মেয়াদি পুঁজির উৎসগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চলতি পুঁজির উৎসসমূহ

স্বল্প মেয়াদি পুঁজির উৎসগুলোর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত উৎসগুলো প্রধান।

- **মালিকের নিজস্ব তহবিল :** ব্যবসায়ের মালিক তার নিজস্ব উৎস থেকে স্বল্প মেয়াদি পুঁজি সরবরাহ করে থাকে।
- **ব্যাংক ঋণ :** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের স্বল্প মেয়াদি পুঁজির সিংহভাগ সরবরাহ করে থাকে।
- **ব্যবসায়িক ঋণ :** ধারে মাল ক্রয় করে স্বল্প মেয়াদি পুঁজির চাহিদা মেটানোকে ব্যবসায়িক ঋণ বলে। ব্যবসায়িক ঋণ স্বল্প মেয়াদি পুঁজির একটি উৎস।
- **বিল বাট্টাকরণ :** সংগৃহীতব্য বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদি মূলধনের প্রয়োজন মেটানো যায়।
- **বন্ধু–বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন :** বিভিন্ন সময়ে বন্ধু–বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে থেকে ধার করে স্বল্প মেয়াদি ঋণের চাহিদা মেটানো যায়।
- **শিল্প ব্যাংক ও অন্যান্য বিশেষ ব্যাংকসমূহ :** সব ব্যাংক দীর্ঘ মেয়াদি মূলধন যোগানের পাশাপাশি চলতি পুঁজির কিছুটা অংশ সরবরাহ করে থাকে।

উপরে বর্ণিত উৎসমূহ ছাড়া অবণ্টিত মুনাফা, অদেয় কর, কাস্টমার প্রদত্ত আমানত স্বল্প মেয়াদি পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

কোন্ কোন্ উৎস থেকে প্রকল্পের অর্থায়ন করা হবে তা নির্ভর করে অর্থ প্রাপ্তির সহজলভ্যতা, ঋণের শর্তাবলি এবং সংশ্লিষ্ট উৎসের মূলধন ব্যয়ের উপর। বিভিন্ন উৎসের মধ্যে সেসব উৎস বেছে নিতে হবে, যাদের বড় পুঁজির ব্যয় ন্যূনতম। নিজস্ব তহবিলের ব্যয় হল এর সুযোগ ব্যয়। অর্থাৎ ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত তহবিল অন্য কোথাও বিনিয়োগ করলে যে আয় হত তা নিজস্ব তহবিলের সুযোগ ব্যয়। ঋণের উপর যে সুদ নিতে হয় তাই ঋণ মূলধন ব্যয়। কাজেই প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূলধনের প্রত্যেক প্রকার ব্যয় তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে ন্যূনতম পুঁজি ব্যয় সংশ্লিষ্ট উৎস নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। পুঁজি ব্যয়ের ক্ষেত্রে যদি কৃচ্ছ্রতা সাধন করা যায় তাহলে ব্যবসায়ের মুনাফা অর্জনের হার বৃদ্ধি পাবে।

ঋণের যথার্থ ব্যবহার (কেস/ইতিবৃত্ত)

বাংলাদেশের আর দশটি গ্রামের মতই একটি গ্রাম হচ্ছে মেদুলিয়া। গ্রামের জনসাধারণের আয়ের একমাত্র উৎস হচ্ছে জমি। জমিগুলো একফসলি, তাও আবার বন্যা কবলিত। অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে গ্রামে সচ্ছল পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ১০%। গ্রামের ৯০% জনসাধারণের একমাত্র সম্বল হচ্ছে বসত ভিটা। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাই বেশির ভাগ গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীকে শ্রম বিক্রি করতে হয়। তাছাড়া, কাঁচামাল বিক্রি, ফেরি করা, দোকান করা, চিঁড়া, মুড়ির ব্যবসায় ইত্যাদি হচ্ছে এ গ্রামের মুষ্টিমেয় লোকের পেশা। এদের বার্ষিক গড় আয় ১০/১২ হাজার টাকা। গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অসচ্ছলতা হেতু এখানে শিক্ষিতের হার মাত্র ৫%। নানা রকম কুসংস্কার মহিলাদের করে রেখেছে পশ্চাৎপদ। তালাক, বহুবিবাহ যদিও এ গ্রামে তেমন জটিল আকারে নেই কিন্তু যৌতুক এখানে অত্যন্ত প্রকট। মহিলাদের আয়ের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার হার যেহেতু কম সেহেতু সামাজিক সচেতনতাও অত্যন্ত কম। ১৯৮২ সালে সিঙ্গাইর উপজেলায় একটি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়। প্রথমেই গ্রামের ৮৫% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য

৪ মাস ধরে উদ্বুদ্ধ করার কাজ চলতে থাকে। এ সংস্থার কর্মীদের কর্মতৎপরতায় এ গ্রামের বেশ কিছু মহিলা উৎসাহিত হয় এবং গ্রামে ৪/৫টি মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে।

দক্ষিণপাড়ার মহিলা উন্নয়ন সংগঠনের ২৬ সদস্যার একজন জামিলা। অত্যন্ত পরিশ্রমী, উদ্যমী ও সৎ চরিত্রের অধিকারী জামিলার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। স্বামীর তেমন কিছু রোজগার নেই। সারাবছর মজুরি খেটে যা কিছু আয় হয় তাই দিয়ে কোন রকমে খেয়ে বা না খেয়ে দিন চলছিল তাদের। সংসারের কাজে সহযোগিতা করার জন্য জামিলাও পরের বাড়িতে কাজ করত। কিন্তু তারপরও এমন দিন গেছে যে, সারাদিন শুধু একবেলা খাবার জুটেছে।

একবার জামিলার স্বামী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। জামিলা তখন চারদিকে অন্ধকার দেখতে থাকে। এ অবস্থায় সাহায্য সংস্থাটির মাঠকর্মীরা তাকে সংগঠন করার পরামর্শ দিলে জামিলা প্রথমে অসম্মতি জানায়, কারণ সে ভাবে তার এমনি দুঃখের সংসার, সারাদিন কাজ করে আহার জোটে না। সেখানে সংগঠন করার তার সময় কোথায়? কিন্তু মাঠ সংগঠনের সভানেত্রী পর পর বেশ কয়েকবার জামিলাসহ অন্যাদের নিয়ে সভার আয়োজন করে ও তাদের সংগঠন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। জামিলা স্বামীর অনুমতি নিয়ে সংগঠনে যোগ দেয়। কারণ তাদের সংসারে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় স্বামী–স্ত্রী উভয়ের মতামত সাপেক্ষে।

সংগঠন যখন মোটামুটি এগিয়ে যাচ্ছে ও সদস্যদের ঋণ দেয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তখন জামিলাও অন্যদের মতো ঋণ নেয়ার কথা চিন্তা করে। যেহেতু টাকার পরিমাণ অল্প সেহেতু অল্প পুঁজিতে কীভাবে আয় করা সম্ভব তা নিয়ে স্বামীর সাথে পরামর্শ করে সংগঠন থেকে ঋণ নিয়ে একটি খাসি ক্রয় করে। সেই খাসি এক বৎসর পালার পর (ঋণের সুদ আসল ফেরত দিয়ে) লাভ হয় ৬৫০ টাকা। পরবর্তী বৎসর খাসির লাভের টাকা ও সংগঠন থেকে পুনরায় ৬০০ টাকা ঋণ নিয়ে ও জামিলার স্বামীর কিছু পুঁজি একত্রিত করে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প হাতে নেয়। ৬ মাস পর কোরবানি ঈদের সময় বিক্রি করে যা আসে তা থেকে সংগঠনের টাকা, খাসির লাভের টাকা, জামিলার স্বামীর টাকা এবং গরুর জন্য খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন সময় যা ক্রয় করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে জামিলার লাভ হয় ২ হাজার ৪শ ৮০ টাকা। এ লাভ দিয়ে পরবর্তী বৎসর কোন ঋণ না নিয়েই জামিলা স্বামীর সহযোগিতায় গরু, খাসি মোটাতাজাকরণ প্রকল্প হাতে নেয়। পূর্বের খাসির লাভ ও স্বামীর পুঁজিতে কেনা হয় দুটো খাসি। জামিলা এবং তার স্বামী দু জনের যেহেতু দৃঢ়সংকল্প ছিল নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার সেহেতু ভীষণ প্রয়োজনেও তাদের কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত টাকা কিছুতেই খরচ করতো না। তবে ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু কেনা–কাটা করতো। এভাবে গরু ও খাসি থেকে তাদের পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ হাজার টাকা।

মেদুলিয়া গ্রামের মাটি আখ চাষের জন্য খুবই উপযোগী বিধায় জামিলা ও তার স্বামীর দীর্ঘদিনের ইচ্ছা কিছু পরিমাণ জমি বর্গা নিয়ে আখ চাষ করার। ১ বৎসরে একই জমিতে পর পর আখ ও সরিষা দুটো অর্থকরী ফসল উৎপন্ন করা যায়। আখ মাড়াই করে গুড় তৈরি একটি লাভজনক ব্যবসায়। এ উদ্দেশ্যে জামিলা সংগঠন থেকে ৪ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। নিজের সঞ্চিত পুঁজি ও ঋণ মিলিয়ে ৪০ শতক জমি ১০ হাজার টাকায় ইজারা নেয়। জমিতে চাষ হয় আখ ও সরিষার। জামিলা সবসময় স্বামীকে কৃষিকাজে সহায়তা করে। খরচ বাদ দিয়ে ১ বৎসরে তাদের লাভ দাঁড়ায় ১০ হাজার টাকা।

পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে এজন্য শুকরিয়া জানায় এবং সংসারে সুখের মুখ দেখতে থাকে জামিলা। শুধু টাকা আয় করাই জামিলার উদ্দেশ্য নয়। সে বর্তমানে তার দু ছেলেকে স্কুলে পড়াচ্ছে। এ ফাঁকে থাকার ঘরের ছাউনি ও পাশের বেড়াগুলো মজবুত করে তৈরি করে নিয়েছে। গরু পালন যেহেতু তাদের একটি লাভজনক ব্যবসায় হিসেবে দাঁড়িয়েছে তাই পাকের ঘরের পাশাপাশি স্থায়ীভাবে একটি গোয়াল ঘরও তৈরি করেছে জামিলা তার স্বামীর সহযোগিতায়।

মেয়েকে বিয়ে দেয় দেখে শুনে। মেয়ের বিয়েতে বেশ কিছু টাকা খরচ হয়। তবে জামিলা ও তার স্বামী বেহিসেবি ছিল না। তার প্রমাণ হচ্ছে এতগুলো টাকা হাতে পেয়েও তারা অপচয় করেনি। হাতে কিছু পুঁজি ঠিকই রেখে দিয়েছিল। এবার জামিলা নিজের মূলধন ১২ হাজার টাকা সংগঠনের ঋণ ৩ হাজার টাকা, মোট ১৫ হাজার টাকা খাটিয়েছে আখ চাষের জমিতে। এবারের জমির পরিমাণ হল ২ পাখি। জামিলার বক্তব্য আল্লাহ যদি না মারেন অর্থাৎ বন্যা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটে তবে প্রতি পাখিতে ১০ হাজার টাকা লাভ হবে।
আসলে উদ্যম ও প্রচেষ্টার সাথে সাথে দলীয় সুযোগ–সুবিধা মানুষকে উন্নতির দিকে ধাবিত করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি কোনটি ?

ক. সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকা
খ. পারস্পরিক সম্প্রীতি
গ. সম্পাদিত চুক্তি
ঘ. সদস্যদের মূলধন

২. অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে মেদুলিয়া গ্রামের সচ্ছল পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ?

i. ২০%
ii. ৩০%
iii. ১০%

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

মিস্ মুন্না বেশকিছু মূলধন নিয়ে একটি বড় ধরনের ব্যবসায় শুরু করেন। মূলধনের কিছু অংশ দিয়ে আসবাবপত্র, দালানকোঠা এবং মেশিনারি ক্রয় করেন। বাকি অংশ দিয়ে ব্যবসায়ের অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

৩. মিস্ মুন্না মূলধনের যে অংশ দিয়ে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করলেন, সেটি কোন ধরনের মূলধন ?

ক. স্থায়ী মূলধন
খ. চলতি মূলধন
গ. স্বল্প মেয়াদি মূলধন
ঘ. স্থায়ী ও চলতি মূলধন

৪. নিচের কোনটি চলতি মূলধন ?

ক. দালানকোঠা
খ. ঘোড়া ও গাড়ি
গ. কর্মচারিদের বেতন
ঘ. ইজারাকৃত সম্পত্তি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব অপু একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী। এজন্য অর্থসংস্থান করতে হয়। যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কর্মচারিদের বেতন, মজুদপণ্য, কাঁচামালের মূল্য, পরিবহণ ব্যয় অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য মূলধনের প্রয়োজন। তিনি নিজস্ব তহবিল থেকে কিছু পুঁজির ব্যবস্থা করেছেন। বাকি পুঁজি সংগ্রহের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ঋণের সদ্ব্যবহার করে ব্যবসায় সাফল্য লাভ করেন।

ক. মূলধনের উৎস কয়টি ?

খ. যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য কোন ধরনের মূলধনের প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা কর।

গ. ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিকাশে স্বল্প মেয়াদি মূলধন কীভাবে ভূমিকা রাখে ?

ঘ. “মি. অপু ঋণের যথার্থ ব্যবহার করে ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করেন”– বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

২. মি. রায় একজন মনিহারি ব্যবসায়ী। তিনি নিজেই ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এতে তার ব্যবসায়ের অপচয় হ্রাস এবং ক্রেতাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব হয়। বর্তমানে তিনি শিল্প স্থাপনে আগ্রহী। এজন্য তার যন্ত্রপাতি, ভূমি এবং কাঁচামালসহ অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য মূলধনের প্রয়োজন। তিনি নিজস্ব তহবিল থেকে কিছু পুঁজির ব্যবস্থা করেন। বাকি পুঁজি সংগ্রহের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ক. একমালিকানা ব্যবসায় বলতে কী বুঝ ?

খ. কোন ব্যবসায়টি অধিক জনপ্রিয় এবং কেন ?

গ. কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য কোন ধরনের মূলধনের প্রয়োজন তা বর্ণনা কর।

ঘ. মি. রায়–এর মনিহারি ব্যবসায় থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উত্তরণ অধিক যুক্তিযুক্ত হবে কিনা এ বিষয়ে মন্তব্য কর।

৩. মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন রকম পেশায় নিয়োজিত থাকেন। কেউ চাকরি, আবার অনেকে ব্যবসায় করেন। ব্যবসায়ের মধ্যে কেউ কেনা–বেচামূলক, কেউ সেবামূলক, আবার কেউ উৎপাদনমূলক ব্যবসায়ে নিয়োজিত। জনাব রাকিব ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসায় করে সফলতা লাভ করেছেন। তিনিই ব্যবসায়ের মালিক বিধায় ব্যবসায় পরিচালনা করতে কারও নিকট আয়–ব্যয় ও অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতে হয় না।

ক. ধরন অনুযায়ী ব্যবসায়কে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?

খ. ট্রাভেল এজেন্সি কোন ধরনের ব্যবসায় এবং কেন ?

গ. আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ছোট ছোট ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোন কোন সংগঠনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে ?

ঘ. সাংগঠনিক ধরন বিবেচনা করলে "একমালিকানা ব্যবসায় কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং বেশি জনপ্রিয়"–এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

অধ্যায় ৬

ব্যবসায়ের প্রাথমিক কার্যাবলি

অধ্যায় সূচি

১. নিবন্ধন ও লাইসেন্স

২. কারখানা অনুমোদন, লাইসেন্স প্রদান ও নিবন্ধনকরণ

৩. শ্রম আইন

৪. শ্রম আইনের আওতা

৫. পণ্য প্রতীক নিবন্ধীকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

৬. ব্যাংক

৭. ব্যাংকের প্রকারভেদ

৮. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

৯. বীমা

১০. বীমার প্রকারভেদ

একটি ব্যবসায় শুরু করার জন্য একজন উদ্যোক্তাকে কতগুলো প্রাথমিক কার্যাবলি সম্পন্ন করতে হয়। এ ছাড়াও তার ব্যবসায় সংক্রান্ত কিছু আইন ও নিয়মাবলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে ব্যবসায়ের নিবন্ধন, লাইসেন্স, শ্রম আইন, দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক লেনদেন ও বীমা সম্পর্কিত নিয়মাবলি আলোচনা করা হবে।

নিবন্ধন ও লাইসেন্স

এক মালিকানা ব্যবসায় : সকল ব্যবসায় সংগঠনের মধ্যে এক মালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ। যদি ব্যবসায়ের জন্য আগ্রহী একজন ব্যক্তির উপযুক্ত স্থান থাকে এবং তিনি পণ্য উৎপাদন অথবা সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে পারেন তবেই তিনি এক মালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। পৌর এলাকায় ব্যবসায় করলে সংশ্লিষ্ঠ পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে এবং পৌর এলকার বাইরে হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে।

অংশীদারি ব্যবসায় : বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসার নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। ব্যবসার নিবন্ধন সম্পূর্ণ অংশীদারদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে অংশীদারি আইনে উল্লিখিত নিয়মানুসারে নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত একটি নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে অংশীদারি কারবার নিবন্ধের জন্য স্থানীয় নিবন্ধকের দফতরে দরখাস্ত করতে হয়। নির্ধারিত ফরমে দরখাস্তের সঙ্গো প্রয়োজনীয় ফী জমা দিতে হয়। উক্ত বিবরণীতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকে?

১. অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের নাম।

২. ব্যবসায়ের ঠিকানা।

৩. যে সকল স্থানে অংশীদারি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় চালাতে পারে তার উল্লেখ।

৪. যে তারিখে প্রত্যেক অংশীদার চুক্তিতে আবন্ধ হয়েছে এবং স্বাক্ষর করেছে তার উল্লেখ।

৫. অংশীদারগণের পুরো নাম ও স্থায়ী ঠিকানা।

৬. ফার্ম কত সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বা এর মেয়াদ।

যৌথ মূলধনী কোম্পানির নিবন্ধন

কোম্পানি আইন অনুসারে প্রবর্তকগণ নিবন্ধনের নিমিত্তে আবেদন করলে নিবন্ধনের প্রমাণ হিসেবে যে দলিল বা অনুমতি পত্র প্রদান করা হয় তাকে নিবন্ধন পত্র বলে। কোম্পানি আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় দলিলসহ নির্দিষ্ট ফী প্রদান করে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হয়। দলিলাদি পরীক্ষা করে নিবন্ধক উপযুক্ত মনে করলেই অনুমতি প্রদান করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে অনুমতিপত্র বা নিবন্ধনপত্র পাওয়ার সঙ্গো সঙ্গো কোম্পানি জন্মলাভ করে। ঘরোয়া পরিমিত দায়সম্পন্ন কোম্পানি বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধনপত্র পাওয়ার অব্যবহিত পরই ব্যবসায় শুরু

করতে পারে, কিন্তু সাধারণ পরিমিত যৌথ–মূলধনী কোম্পানি বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে ব্যবসায় আরম্ভ করার জন্য কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সাধারণ পরিমিত যৌথ–মুলধনী কোম্পানি শুধু বিবরণপত্র প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে শেয়ার ক্রয় করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে।

নিবন্ধন পদ্ধতি

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে সাতজন প্রবর্তক এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে ২ জন প্রবর্তক কোম্পানির নিবন্ধকের অফিস থেকে নির্ধারিত ফী প্রদানপূর্বক নির্দিষ্ট আবেদন পত্রের ফরম সংগ্রহ করে উক্ত ফরম যথারীতি পূরণ করে নিম্নলিখিত তথ্যাদিসহ নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়।

ক) স্মারকলিপির একটি কপি
খ) পরিমেল নিয়মাবলির একটি কপি
গ) প্রস্তাবিত মূলধনের বিবরণ
ঘ) আইনের ধারা পালনের ঘোষণাপত্র

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির বেলায় আবেদন পত্রের সাথে উপরিউক্ত দলিলগুলো থাকলেই চলে। কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বেলায় আরও কিছু দলিলপত্রাদি সংযোজন করতে হয়। সেগুলো হল :

ক) যে সকল উদ্যোক্তাগণ পরিচালক হতে ইচ্ছুক তাদের নাম, ঠিকানা ও পেশা।
খ) পরিচালক হিসেবে কাজ করার সম্মতিসূচক পত্র।
গ) পরিচালকের যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি।

উপরিউক্ত আবেদনপত্র ও তৎসংযুক্ত দলিল পত্রাদি নিবন্ধক পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে নিবন্ধন বইতে কোম্পানির নাম তালিকাভুক্ত এবং নিবন্ধন পত্র প্রদান করেন।

কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র

নিবন্ধন পত্র পাওয়ার পরই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কার্য আরম্ভ করতে পারে। কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হয়।

কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত দলিলগুলোসহ একটি আবেদনপত্র নিবন্ধকের নিকট পেশ করতে হয়।

ক) বিবরণ পত্রের (Prospectus) একটি কপি।

খ) পরিচালকগণ যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয় করেছে এবং সে অর্থ সংগৃহীত হয়েছে এ মর্মে একটি ঘোষণা পত্র।

গ) আইনের ধারা যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে এ মর্মে কোম্পানির পরিচালক অথবা একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা পত্র।

উপরিউক্ত দলিল পত্রাদি পাঠ করে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে উক্ত কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র প্রদান করেন। এ অনুমতি পত্র পাওয়ার পরই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কাজ আরম্ভ করতে পারে।

নিম্নে নিবন্ধন পত্রের একটি নমুনা প্রদর্শন করা হল।

কোম্পানির নিবন্ধনের অনুমতি পত্র

নং .... তাং ....

আমি এতদ্বারা নিশ্চিতভাবে বলছি যে, কোম্পানি আইন (১৯৯৪ সালের) অনুযায়ী রহমান এন্ড কোং লিমিটেডকে অদ্যকার তারিখে সমিতিবদ্ধ করা হল এবং এটি সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট কোম্পানি। ২০০৮ সালের ৫ই জুলাই তারিখে বেলা ১১টার সময় আমার নিজ স্বাক্ষর প্রদত্ত হল।

সিলমোহর যৌথ–মূলধনী কোম্পানির নিবন্ধক

সমবায় সমিতি / সংগঠন

সমবায় সমিতি/সংগঠনকে যৌথ মূলধনী কোম্পানি সংগঠনের মতো মনে হলেও সমবায় সংগঠন কতগুলো বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল ব্যবহৃত হয়, যার নাম সমবায় সমিতির উপবিধি। এ দলিল সংগঠনের নিবন্ধকের কাছে নিবন্ধনের জন্য দাখিল করতে হয়। নিবন্ধনের আবেদন পত্রের সাথে প্রবর্তকগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত উপবিধির তিন কপি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়। নির্ধারিত আবেদনপত্র এবং উপবিধির অনুলিপি প্রবর্তকগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে। প্রাসঙ্গিক যাবতীয় কাগজপত্র পরীক্ষা–নিরীক্ষা করার পরে যদি নিবন্ধক সন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি সমিতি নিবন্ধনের একটি সনদ ইস্যু করতে পারেন। নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির পরপরই সমবায় সমিতি কার্যাবলি শুরু করতে পারে।

কারখানা অনুমোদন, লাইসেন্স প্রদান ও নিবন্ধনকরণ

ইতোপূর্বে বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনের বিধানমতে কারখানা পরিচালিত হত। বর্তমানে এ আইন প্রচলিত নেই। বর্তমানে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রচলিত আছে। এ আইনের ৩২৬ নং ধারার ১নং উপ–ধারা মোতাবেক কারখানা নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রধান পরিদর্শকের (Chief Inspector) নিকট থেকে লিখিতভাবে পুর্বানুমতি নেওয়া আবশ্যক। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ৩২৬ নং ধারার ২নং উপ–ধারাতে বলা হয়েছে যদি উপধারা (১) মোতাবেক অনুমতির জন্য নক্শাসহ কোনো দরখাস্ত প্রধান পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করার পর দরখাস্ত প্রাপ্তির দুই মাসের (৬০ দিন) মধ্যে কোনো আদেশ দরখাস্তকারীকে প্রদান করা না হয় তাহলে প্রার্থীত অনুমতি প্রদান করা হয়েছে বলে গন্য হবে।

একই আইনের উপ–ধারা (৩) এ বলা হয়েছে– যে ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শক কোনো কারখানা নির্মাণ বা সম্প্রসারণের জন্য অথবা ইহা নিবন্ধনকরণ বা ইহার জন্য লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি প্রদান করতে অস্বীকার করেন সে ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী, উক্ত অস্বীকৃতির ষাট (৬০ দিন) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করতে পারবেন।

নতুন/ অস্থিতিশীল শিল্প কারখানা নিবন্ধনের জন্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনে দরখাস্ত করা যায়। নিচে একটি দরখাস্ত ফরমের নমুনা দেখানো হল :

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন

নতুন/অস্থিতিশীল শিল্প কারখানার রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্তের ফরম

১। প্রকল্পের নাম :

২। শিল্প কারখানার অবস্থান : জিলা/হোল্ডিং নং থানা/প্লট নং ইউনিয়ন/ওয়ার্ড/এলাকা/ জে,এল, নং–

৩। শিল্প স্থাপনের তারিখ :

৪। উৎপাদন আরম্ভের তারিখ :

৫। শিল্প খাত :

৬। উদ্যোক্তা/উদ্যোক্তাদের বিবরণ :

ক) নাম :

খ) পিতা/স্বামীর নাম :

গ) বর্তমান ঠিকানা :

ঘ) স্থায়ী ঠিকানা :

ঙ) জাতীয়তা :

চ) অভিজ্ঞতা :

৭। বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায়) :
ক) ভূমি :
খ) দালানকোঠা
গ) যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি :
ঘ) অন্যান্য নির্ধারিত ব্যয় :

....

মোট টাকা

(ভূমি ও দালানকোঠার মালিকানা বা ভাড়ার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে)

৮। উৎপাদনযোগ্য পণ্যের নাম : বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী) আনুমানিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)

৯। কাঁচামালের ও মোড়ক বাঁধাই উপকরণের বার্ষিক চাহিদা :
কাঁচামালের বিবরণ : পরিমাণ মূল্য (লক্ষ টাকায়)
ক) স্থানীয় :
খ) আমদানিযোগ্য :

মোট মূল্য টাকা ....

১০। যন্ত্রাংশের বার্ষিক চাহিদা :
ক) স্থানীয় :
খ) আমদানিযোগ্য :

১১। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির বিবরণ : ইতোমধ্যে সংগৃহীত মূল্য (লক্ষ টাকায়)
ক) স্থানীয় :
খ) আমদানিযোগ্য : সংগৃহীতব্য

বৈদেশিক মুদ্রা সমপরিমাণ টাকা (লক্ষ টাকায়)

....

ঋণপত্র খোলা হয়েছে :
আমদানি করা হবে :

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অ) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি হলে ঋণপত্র (এল,সি), ইনভয়েস এর অনুলিপি দাখিল করতে হবে।
(আ) অর্থ যোগানের উৎস (ওয়েজ আর্নার স্কীম/সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট/পে-অর্ডার অন্যান্য উল্লেখ করতে হবে।
(ই) স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি হলে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের রসিদ/ চুক্তিনামার অনুলিপি দাখিল করতে হবে।

১২। নিয়োজিত/নিয়োগযোগ্য কর্মচারি সংখ্যা :–
১৩। প্রকৃত বিদ্যুৎ জ্বালানি চাহিদা (কিলোওয়াট) :–
১৪। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিবরণ :–

স্বত্বাধিকারী / ব্যবস্থাপনা অংশীদার

শ্রম আইন

শ্রম আইনের সংজ্ঞা : শিল্প এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের কাজের শর্ত ও অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা বা মালিকের সম্পর্কের উন্নতি সাধনের জন্য যে আইন প্রবর্তন করা হয়েছে, তাকেই শ্রম আইন বলা হয়।

শ্রম আইনের পটভূমিকা

বাংলাদেশে শ্রম ও শিল্প আইনের উৎপত্তিকে আমরা নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভক্ত করে বর্ণনা করতে পারি :

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী অধ্যায় : ১৮৮১ সালের পূর্বে বঙ্গ–ভারত উপমহাদেশে, কোনো সংগঠিত শিল্প আইন ছিল না। তখনকার দিনের শিল্প আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা। সে সময় এ উপমহাদেশে সংগঠিত শিল্পের মধ্যে চা–বাগান, খনিজ এবং কাগজের মিলগুলোই ছিল প্রধান এবং শিল্প আইনগুলো কেবলমাত্র ঐ সকল শিল্প–কারখানার জন্য প্রযোজ্য ছিল। এ দেশে ১৮৬৩ হতে ১৯০১ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শিল্প–আইন প্রবর্তিত হয়। এ সকল শিল্প–আইনে শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অনেকটা কেনা গোলামের মত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্বের প্রবর্তিত অনেক শিল্প–আইনকে সংশোধন করা হয়। ইতোমধ্যে ১৯১১ সালে 'কারখানা আইন' (Factory Act) নামক একটি শিল্প–আইন আইন পরিষদে পাস করিয়ে নেয়া হয়। এ আইন মোতাবেক বস্ত্র শিল্পে (Textile) পুরুষ শ্রমিকদের দৈনিক কার্যসীমা ১২ ঘণ্টা, নারী ও শিশু শ্রমিকদের বেলায় দৈনিক ৬ ঘণ্টা নির্ধারিত হয়। তাছাড়া, কারখানার বিপজ্জনক অংশে নারী এবং শিশু শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ হতে বিরত রাখতে এবং বিকাল ৭টা হতে সকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত কোনো কোনো শিল্পে কাজ করা হতে বিরত থাকার ব্যবস্থা এ আইনে ছিল। বাংলাদেশে বর্তমানে শ্রম সম্পর্কিত ২৫টি আইন রহিত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রবর্তন করা হয়েছে।

শ্রম আইনের আওতা

বিভিন্ন শিল্প ও উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের কার্য, পরিবেশ এবং শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক শ্রম ও শিল্প আইন প্রবর্তিত হয়েছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধান, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার মধ্যে উত্তম ও প্রীতিকর সম্পর্ক স্থাপন, শ্রমিকদের মজুরি প্রদান ও শাস্তি বিধান, নিয়োগকর্তাদের নিজেদের মধ্যে অথবা নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে অথবা শ্রমিকদের নিজের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ শ্রম আইনের আওতাভুক্ত। এ সকল বিষয়ে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা উভয়েরই সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শ্রম আইন পাঠের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ ও নিয়োগকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ কর্তব্য, অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে যথাবিহীত সজাগ থাকার প্রয়াস পায়।

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে স্পষ্টই বলা যায়, আইন পাঠের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। শ্রম আইন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকা প্রত্যেক উদ্যোক্তার জন্যই জরুরি। কেননা শ্রম আইন একটি বিশেষ ধরনের আইন যা কোনো দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শ্রমিকের জন্য প্রযোজ্য।

শ্রম আইন কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল ব্যক্তিদের মালিক অথবা শ্রমিক হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। এ আইনে শ্রমিক অর্থ কোনো দোকান বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোনো দক্ষ, অদক্ষ, দৈহিক, কারিগরি, বাণিজ্য সংক্রান্ত বা কেরানিগিরি ধরনের কাজ করার জন্য মজুরি প্রদানের ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝায়, তার চাকরির শর্ত ব্যক্ত বা অব্যক্ত যেমনই হোক না কেন। কিন্তু ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এর আওতায় পড়বে না।

ইতোপূর্বে বাংলাদেশে নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান শ্রম আইনগুলো প্রচলিত ছিল :

১. কারখানা আইন, ১৯৬৫

২. দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৬৫

৩. শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ), ১৯৬৫

৪. শ্রমিক সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯

৫. মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬
৬. শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩
৭. বাংলাদেশে মাতৃত্ব কল্যাণ আইন, ১৯৩৯

বর্তমানে উল্লিখিত আইনগুলোসহ মোট ২৫টি আইন রহিত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসারে নিম্নে কারখানা, শ্রমিক, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও মৌসুমী কারখানা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

কারখানা আইন

১। **কারখানা (Factory) :** "কারখানা" অর্থ এমন কোনো ঘর–বাড়ি বা আঙ্গিনা যেখানে বৎসরে কোনো দিন সাধারণত: পাঁচ জন বা ততোধিক শ্রমিক কর্মরত থাকেন এবং উহার যে কোনো অংশে কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু থাকে, কিন্তু কোনো খনি ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে না। [২ (৭ ধারা]

২। **শ্রমিক (Worker) :** "শ্রমিক" অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোনো ব্যক্তি, তার চাকুরির শর্তাবলী প্রকাশ্য বা উহ্য যেভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোনো ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোনো দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরী, ব্যবসায় উন্নয়নমূলক অথবা কেরানীগিরির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রধানত: প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনামুলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হবেন না। [২(৬৫) ধারা]

৩। **উৎপাদন প্রক্রিয়া** "উৎপাদন প্রক্রিয়া" অর্থ নিম্নোক্ত যে কোনো প্রক্রিয়াকে বুঝাবে যথা–

ক) কোনো বস্তু বা পদার্থের ব্যবহার, বিক্রয়, পরিবহণ, বিতরণ, প্রদর্শন বা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে উহা প্রস্তুত, পরিবর্তন, মেরামত, অলংকরণ, রংকরণ, ধৌতকরণ, সম্পূর্ণ বা নিখুঁতকরণ, গাঁট বা মোড়কবন্দীকরণ অথবা অন্য কোনোভাবে নির্মাণ প্রক্রিয়ায় আরোপকরণ

খ) তৈল, গ্যাস, পানি, নর্দমার ময়লা অথবা অন্য কোনো তরল আবর্জনা পাম্প করার প্রক্রিয়া

গ) শক্তি বা গ্যাস উৎপাদন, হ্রাস–বৃদ্ধিকরণ বা প্রেরণ প্রক্রিয়া

ঘ) জাহাজ বা নৌ–যান নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত, সম্পূর্ণ বা নিখুঁতকরণ বা ভাঙ্গানের প্রক্রিয়া

ঙ) লেটার প্রেস, লিথোগ্রাফি, ফটোগ্রেভোর, কম্পিউটার, ফটো কম্পোজ, অফসেট অথবা অনুরূপ কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা ছাপার কাজ অথবা বই–বাঁধাই এর প্রক্রিয়া যা ব্যবসায় হিসাবে অথবা মুনাফার জন্য অথবা অন্য কোনো ব্যবসার আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে পরিচালিত হয়।

৪। **মৌসুমী কারখানা :** বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬–এর ৩২৮ ধারায় মৌসুমী কারখানার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে– সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনো বৎসরে সাধারণত: একশত আশি কর্মদিবসের অধিক কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু থাকে না এবং কেবল মাত্র কোনো বিশেষ মৌসুম ছাড়া অন্য কোনো সময় অথবা প্রাকৃতিক শক্তির অনিয়মিত ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করা ছাড়া চালু রাখা যায় না এরূপ কোনো কারখানাকে, এ আইনের উদ্দেশ্যে মৌসুমী কারখানা বলে ঘোষণা করতে পারবে।

প্রধান পরিদর্শক ও পরিদর্শক

এ আইনের উদ্দেশ্যে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা একজন প্রধান পরিদর্শক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ–প্রধান পরিদর্শক, সহকারী প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক নিযুক্ত করে এ আইনের অধীনে তাদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র বা এলাকা বা এখতিয়ারাধীন প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করে দিতে পারেন।

প্রধান পরিদর্শকের এ আইনের অধীন তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়াও সমগ্র দেশে একজন পরিদর্শকের ক্ষমতা থাকবে। এছাড়াও প্রধান পরিদর্শকের সকল উপ–প্রধান পরিদর্শক, সহকরীপ্রধান পরিদর্শক এবং পরিদর্শকের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে।

প্রধান পরিদর্শক, লিখিত–সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা তাঁর কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব কোনো উপ–প্রধান পরিদর্শক, সহকারী প্রধান পরিদর্শক বা পরিদর্শকের উপর অর্পণ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, এর ১১৪ ধারায় দোকান বা বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

দোকান, ইত্যাদি বন্ধ

(১) প্রত্যেক দোকান বা বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতি সপ্তাহে অন্তত: দেড় দিন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

(২) কোনো এলাকায় উক্তরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান কোন দেড় দিন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে তা প্রধান পরিদর্শক স্থির করে দিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান পরিদর্শক সময় সময় জনস্বার্থে উক্তরূপ নির্ধারিত দিন কোনো এলাকার জন্য পুন:নির্ধারিত করতে পারবেন।

(৩) কোনো দোকান, কোনো দিন রাত্রি আট ঘটিকার পর খোলা রাখা যাবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো গ্রাহক যদি উক্ত সময়ে কেনা–কাটার জন্য দোকানে থাকেন তা হলে উক্ত সময়ের অব্যবহিত আধাঘণ্টা পর পর্যন্ত উক্ত গ্রাহককে কেনা কাটার সুযোগ দেওয়া যাবে।

(৪) সরকার, বিশেষ অবস্থা বিবেচনায়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো মৌসুমে নোটিশে উল্লিখিত শর্তে কোনো এলাকার দোকানের বন্ধের সময় পরিবর্তন করতে পারবে।

তবে এ ধারার বিধানাবলী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যথা :

(ক) ডক, জেটি, স্টেশন অথবা বিমান বন্দর এবং পরিবহন সার্ভিস টার্মিনাল অফিস;

(খ) প্রধানত: তরি-তরকারি, মাংস, মাছ, দুগ্ধ জাতীয় সামগ্রী, রুটি, পেস্ট্রি, মিস্টি এবং ফুল বিক্রির দোকান

(গ) প্রধানত: ঔষধ, অপারেশন সরঞ্জাম, ব্যান্ডেজ অথবা চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান

(ঘ) দাফন ও অন্ত্যেস্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রির দোকান

(ঙ) প্রধানত: তামাক, সিগার, সিগারেট, পান–বিড়ি, বরফ, খবরের কাগজ, সাময়িকী বিক্রির দোকান এবং দোকানে বসে খাওয়ার জন্য তরল নাশতা বিক্রির খুচরা দোকান

(চ) খুচরা পেট্রোল বিক্রির জন্য পেট্রোল পাম্প এবং মেরামত কারখানা নয় এমন মোটর গাড়ীর সার্ভিস স্টেশন

(ছ) নাপিত এবং কেশ প্রসাধনীর দোকান

(জ) যে কোনো ময়লা নিষ্কাশন অথবা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

(ঝ) যে কোনো শিল্প, ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠান যা জনগণকে শক্তি, আলো–অথবা পানি সরবরাহ করে

(ঞ) ক্লাব, হোটেল, রেস্তোরাঁ, খাবার দোকান, সিনেমা অথবা থিয়েটার।

তবে শর্ত থাকে যে, একই দোকানে অথবা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে যদি একাধিক ব্যবসায়–বাণিজ্য পরিচালিত হয় এবং উহাদের অধিকাংশ তাদের প্রকৃতির কারণে এ ধারার অধীন অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য হয় তা হলে সমগ্র দোকান বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে উক্তরূপ অব্যাহতি প্রযোজ্য হবে।

আরো শর্ত থাকে যে, প্রধান পরিদর্শক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উপরোক্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান শ্রেণীর জন্য উহার খোলা ও বন্ধের সময় স্থির করে দিতে পারবেন।

দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজের ঘন্টা, ওভারটাইম ও মজুরি

১। কার্যঘণ্টা : কোনো প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিককে কোনো প্রতিষ্ঠানে সাধারণত: এ আইনের উদ্দেশ্যে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া দৈনিক ৮ ঘণ্টার অধিক সময় কাজ করানো যাবে না।

২। **সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা :** কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে কোনো প্রতিষ্ঠানে এ আইনের উদ্দেশ্যে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণত: সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার অধিক সময় কাজ করানো যাবে না।

৩। **ওভারটাইম :** কোনো শ্রমিককে ওভারটাইম কাজ করতে বলা যেতে পারে তবে ওভারটাইমসহ সপ্তাহে কর্মঘণ্টা ৬০ ঘন্টার বেশি হবে না এবং কোনো বৎসরে উহা গড়ে প্রতি সপ্তাহে ৫৬ ঘণ্টার অধিক হবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, কোনো সড়ক পরিবহণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো শ্রমিকের সর্বমোট অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা বৎসরে ১৫০ ঘণ্টার অধিক হবে না।

৪। **অতিরিক্ত মজুরি :** ওভার টাইমের মজুরির হার সাধারণ মজুরির হারের দ্বিগুণ হবে।

৫। **বিশ্রাম :** কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো শ্রমিক–

ক) দৈনিক ৬ ঘণ্টার অধিক কাজ করতে বাধ্য থাকবে না, যদি না উক্ত দিনে তাকে বিশ্রাম বা আহারের জন্য ১ ঘণ্টা বিরতি দেওয়া হয়।

খ) দৈনিক ৫ ঘণ্টার অধিক কাজ করতে বাধ্য থাকবে না, যদি না উক্ত দিনে তাকে ১/২ ঘণ্টা বিরতি দেওয়া হয়।

গ) দৈনিক ৮ ঘণ্টার অধিক কাজ করতে বাধ্য থাকবে না, যদি না উক্ত দিনে তাকে দফা (ক) এর অধীন একটি বিরতি অথবা দফা (খ) এর অধীন দুটি বিরতি দেওয়া হয়।

৬। **মজুরি পরিশোধের সময় :** কোনো শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরি তাহার মজুরিকাল শেষ হওয়ার পরবর্তী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

যে ক্ষেত্রে কোনো শ্রমিকের চাকরি যে কোনো কারণে অবসান হয় সে ক্ষেত্রে চাকরি অবসানের তারিখ হতে পরবর্তী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে মজুরি পরিশোধ করতে হবে এবং সকল মজুরি কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

৭। **উৎসব ছুটি :** প্রত্যেক শ্রমিক প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে ১১ দিনের মজুরিসহ উৎসব ছুটি পাবেন। তবে বিধি দ্বারা নির্ধারিতভাবে মালিক উক্ত ছুটির দিন ও তারিখ স্থির করবেন।

কোনো শ্রমিককে দিয়ে উৎসব ছুটিতে কাজ করাতে হলে তাকে ২ দিনের মজুরিসহ ক্ষতিপূরণ ছুটি এবং একটি বিকল্প ছুটি মঞ্জুর করতে হবে।

৮। **নৈমিত্তিক ছুটি :** একজন শ্রমিক একটি পঞ্জিকা বৎসরে পূর্ণ মজুরিতে ১০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি পাবার অধিকারী হবেন। ভোগ না করলে নৈমিত্তিক ছুটি জমা থাকে না। তাছাড়াও এক বৎসরের ছুটি অন্য বৎসরে ভোগ করা যাবে না।

৯। **অসুস্থতার জন্য ছুটি :** সংবাদপত্র শ্রমিক ব্যতিত প্রত্যেক শ্রমিক প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে পূর্ণ মজুরিতে ১৪ দিনের ছুটি পাবেন। প্রত্যেক সংবাদপত্র শ্রমিক তার চাকরির মেয়াদের অন্যুন এক-অষ্টাদশ অংশ সময় অর্ধ মজুরিতে অসুস্থতা ছুটি পাবার অধিকারী হবেন।

এরূপ ছুটি জমা থাকবে না এবং এক বৎসরে ভোগ না করলে পরবর্তী বৎসরে উহা ভোগ করা যাবে না।

১০। **মহিলা শ্রমিকের জন্য সীমিত কর্মঘন্টা :** কোনো মহিলা শ্রমিককে তার বিনা অনুমতিতে কোনো প্রতিষ্ঠানে রাত দশ ঘটিকা হতে ভোর ছয় ঘটিকা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না।

১১। **সমকাজের জন্য সম-মজুরি প্রদান :** কোনো শ্রমিকের জন্য কোনো মজুরি নির্ধারণ বা নিম্নতম মজুরির হার স্থিরকরণের ক্ষেত্রে একই প্রকৃতির বা একই মান বা মূল্যের কাজের জন্য মহিলা এবং পুরুষ শ্রমিকগণের জন্য সমান মজুরির নীতি অনুসরণ করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে নারী–পুরুষ ভেদের কারণে কোনো বৈষম্য করা যাবে না।

শ্রমিক নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী :

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের নিয়োগ ও তৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি অত্র আইনের বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। তবে কোনো প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকরি বিধি থাকতে পারে যদি তা কোনো শ্রমিকের জন্য এ আইনের কোনো বিধান হতে কম অনুকূল না হয়।

তবে এরূপ চাকরি বিধি প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদন থাকতে হবে। প্রধান পরিদর্শকের অনুমোদন ব্যতিত কোনো চাকরি বিধি কার্যকর করা যাবে না।

এরূপ অনুমোদনের কোনো বিধান সরকারের মালিকানাধীন, ব্যবস্থাপনাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

শ্রমিকের শ্রেণী বিভাগ

কাজের ধরন ও প্রকৃতির ভিত্তিতে কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকগণকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

ক) শিক্ষানবীশ
খ) বদলী
গ) অস্থায়ী
ঘ) সাময়িক
চ) স্থায়ী

চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ

এ আইনে লে-অফ, ছাঁটাই, ডিসচার্জ এবং চাকরির অবসান সম্পর্কে অন্যত্র যাহা কিছু বলা থাক না কেন, কোনো শ্রমিককে বিনা নোটিশে বা নোটিশের পরিবর্তে বিনা মজুরিতে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে, যদি তিনি–

ক) কোনো ফৌজদারী অপরাধের জন্য দন্ডপ্রাপ্ত হন
খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন

তবে অসদাচারণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত কোনো শ্রমিককে চাকুরি হতে বরখাস্তের পরিবর্তে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে :

ক) অপসারণ
খ) নিচের পদে, গ্রেডে বা বেতন স্কেলে অনধিক ১ বৎসর নামিয়ে দেয়া
গ) অনধিক এক বৎসরের জন্য পদোন্নতি বন্ধ
ঘ) অনধিক এক বৎসরের জন্য মুজুরি বৃদ্ধি বন্ধ
ঙ) জরিমানা
চ) অনধিক ৭ দিন পর্যন্ত বিনা মজুরিতে বা বিনা খোরাকীতে সাময়িক বরখাস্ত
ছ) ভৎসনা ও সতর্কীকরণ

শাস্তি দানের পদ্ধতি

কোনো শ্রমিকের বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ প্রদান করার পূর্বে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে :

ক) অভিযোগ লিখিতভাবে করতে হবে
খ) অভিযোগের একটি কপি শ্রমিককে দিতে হবে এবং জবাব দেওয়ার জন্য অন্তত: ৭ দিন সময় দিতে হবে।
গ) অভিযুক্ত শ্রমিককে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।
ঘ) তদন্তের পর তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে।
ঙ) মালিক বা ব্যবস্থাপক কর্তৃক বরখাস্তের আদেশ অনুমোদন করতে হবে।

পণ্য প্রতীক নিবন্ধীকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করতে চাইলে বা সে বিশেষ পণ্যটিকে বাজারে প্রচলিত অনুরূপ অন্যান্য পণ্য থেকে আলাদা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে প্রয়োজনবোধে সে পণ্যের প্রতীক (ট্রেড মার্ক) রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ স্টান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বা বি.এস.টি.আই (১১৬–ক,

তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা–১২০৮) পণ্যের প্রতীক নিবন্ধীকরণের দায়িত্ব পালন করে। নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে এবং প্রয়োজনীয় ফী জমা দিয়ে পণ্য প্রতীক বা ট্রেড মার্ক নিবন্ধীকরণ করা যেতে পারে। তদুপরি কতিপয় নির্ধারিত পণ্যের মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত মান অনুযায়ী সে সকল পণ্য উৎপাদন করে বি.এস.টি.আই থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সনদপত্র বা সার্টিফিকেট নিতে হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে সার্টিফিকেশন এর আওতাধীন পণ্যের তালিকা সংরক্ষণ করে। নির্ধারিত মান অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বি.এস.টি.আই কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেশন বা লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। কোনো কোনো পণ্য বি.এস.টি.আই এর বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্ক এর আওতাধীন এবং সে সকল পণ্যের নির্ধারিত মান বি.এস.টি.আই থেকে জানা যাবে। উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বি.এস.টি.আই প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

ব্যাংক

যে সকল প্রতিষ্ঠান অর্থ ও ঋণ নিয়ে ব্যবসায় করে তাদেরকে ব্যাংক বলে। ব্যাংকের প্রধান কাজ হল জনসাধারণের সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে একত্রিত করা এবং সে অর্থ বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঋণ হিসেবে প্রদান করা।

যারা ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তারা ব্যাংক থেকে সুদ পায় এবং যারা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে তারা ব্যাংককে সুদ দেয়। এ দুই সুদের পার্থক্যই হল ব্যাংকের মুনাফা এবং এর উপরেই ব্যাংকের ব্যবসায় টিকে থাকে। তাই বলা যায় যে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমাজের এক শ্রেণীর লোকের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা অপর শ্রেণীর লোককে সুদের পরিবর্তে ধার দেয় তাকেই ব্যাংক বলা হয়।

ব্যাংকের প্রকারভেদ

ব্যাংকের গঠন ও কাজের প্রকৃতি অনুসারে এদেরকে নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা চলে :

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক : পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা ব্যবসায় ও ব্যাংক ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম 'বাংলাদেশ ব্যাংক'।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক : বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রধানত স্বল্প মেয়াদি ঋণ নিয়ে কারবার করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণের অর্থ আমানত হিসেবে গচ্ছিত রাখে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থাকে স্বল্প মেয়াদি ঋণ দান করে ব্যবসায়–বাণিজ্য ও উৎপাদন কাজে সহায়তা করে। সোনালী ব্যাংক এ ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদাহরণ।

৩. শিল্প ব্যাংক : বিভিন্ন শিল্প সংস্থাসমূহে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প ব্যাংক গঠিত হয়। 'বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক' এ ধরনের ব্যাংকের উদাহরণ।

৪. কৃষি ব্যাংক : কৃষিক্ষেত্রে মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ দানের উদ্দেশ্যে কৃষি ব্যাংক গঠিত হয়। 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক' এ ধরনের ব্যাংকের উদাহরণ।

৫. সমবায় ব্যাংক : এগুলো সমবায় পদ্ধতিতে গঠিত ব্যাংক। সমবায় সমিতিগুলোকে ঋণ দান করাই এদের মূল উদ্দেশ্য। এ সমস্ত ব্যাংক দরিদ্র কৃষক ও কুটির শিল্প মালিকদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে।

৬. বিনিময় ব্যাংক : বিনিময় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে ব্যবসায় করে। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ করাই এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

দেশের অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলিকে প্রধানত: তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–(ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি (খ) প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি এবং (গ) সাধারণ সুবিধামূলক কার্যাবলি।

নিচে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি উল্লেখ করা হল :

ক. সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি : বাণিজ্যিক ব্যাংক নিম্নোক্ত সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে :

১. আমানত গ্রহণ করা : বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হল ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে আমানতের আকারে একত্রিত করা। **আমানত তিন প্রকারের হতে পারে :** (ক) চলতি আমানত (খ) সঞ্চয়ী আমানত এবং (গ) স্থায়ী আমানত। চলতি আমানত থেকে ইচ্ছানুযায়ী টাকা উঠান চলে। কিন্তু সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানত থেকে টাকা উঠানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা নিষেধ থাকে। চলতি আমানতের জন্য ব্যাংক কোনো রকম সুদ দেয় না। তবে সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানতের জন্য ব্যাংক সুদ প্রদান করে।

২. ঋণ দান করা : জনসাধারণের নিকট থেকে আমানতরূপে প্রাপ্ত অর্থ থেকে ব্যাংক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সংস্থাগুলোকে ঋণ দেয় এবং সেখান থেকে সুদরূপে আয় উপার্জন করে। ব্যাংক নানাভাবে ঋণদান করে। **প্রথমত,** ব্যাংক সরাসরি নগদ টাকায় ঋণ দিতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** ব্যাংক আমানতকারীকে জমা অপেক্ষা অধিক টাকা তোলার সুবিধা দিতে পারে। **তৃতীয়ত,** ব্যাংক বিল বাট্টা করতে পারে। ব্যাংক আমানতকারীকে যে সুদ দেয় এবং ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে যে সুদ পায়–এ দুইয়ের পার্থক্যই হল ব্যাংকের আয়। ব্যাংক সাধারণত মূল্যবান সম্পত্তির জামিনে ঋণ প্রদান করে।

৩. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করা : চেকের মাধ্যমে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা করা : বাণিজ্যিক ব্যাংক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও সহায়তা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা প্রেরণ করে।

খ. প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি : ব্যাংক মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। এগুলো নিম্নরূপ :

১. মক্কেলদের প্রতিনিধিরূপে ব্যাংক শেয়ার ক্রয় করে। বাজারের অবস্থা সম্পর্কে ভালোরূপে ওয়াকেফহাল থাকে বলে ব্যাংক এ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে।

২. ব্যাংক মক্কেলদের প্রতিনিধিরূপে বীমা প্রিমিয়াম দেয়, আয়করের হিসাব দাখিল করে এবং পেনশনের টাকা, ব্যবসায়ের লভ্যাংশ, মূলধনের সুদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

৩. ব্যাংক অনেক সময় বিল ক্রয় করে এবং তা ভাঙিয়ে বাট্টা আদায় করে।

৪. ব্যাংক মক্কেলদের হিসাবপত্র রক্ষা করে এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

৫. ব্যাংক মক্কেলদের অছি (Trustee) রূপে তাদের বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করে।

গ. সাধারণ সুবিধামূলক কার্যাবলি : প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি ছাড়াও ব্যাংক মক্কেলদের সাধারণ সুবিধা ও নিরাপত্তামূলক সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে কতিপয় কার্যাবলি সম্পাদন করে। এগুলো নিম্নরূপ :

১. ব্যাংক দলিলপত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করে।

২. ব্যাংক মক্কেলদের আর্থিক অবস্থা ও ব্যবসায়ের সুনাম সম্বন্ধে সার্টিফিকেট প্রদান করে।

৩. ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত লেনদেন নিষ্পত্তি করে থাকে।

৪. ব্যাংক আমদানি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঋণপত্র প্রদান করে।

৫. দূর দেশে ভ্রমণকারীদের জন্য ব্যাংক এক বিশেষ ধরনের চেক ব্যবহার করতে দেয়। এটি ভ্রমণকারীদের চেক (Traveller's Cheque) নামে পরিচিত। এটি ভ্রমণকারীদের জন্য বিশেষ সহায়ক।

৬. আমানতকারীদের অনুরোধে ব্যাংক তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে।

৭. ব্যাংক সরকার, জনস্বার্থমূলক প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির ঋণ অবলিখন (Under writing) করে থাকে।

বীমা (Insurance)

বর্তমান যুগে ব্যবসায়ীগণ বহুবিধ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক স্তরেই কিছু–না–কিছু ঝুঁকি বিদ্যমান। যেমন, জিনিসপত্রের ক্ষয়ক্ষতি, চুরির ঝুঁকি, অগ্নি, নৌ, রেল অথবা মোটর দুর্ঘটনা, অপহরণ প্রভৃতি কারণে পণ্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এসব ঝুঁকিজনিত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির একটি প্রধান উপায় বীমা।

যে চুক্তির মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো ঘটনাজনিত ক্ষতির বা ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বীমা বলে। উক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য বা নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের জন্য যে পক্ষ স্বীকৃত হয় তাকে বীমাকারী এবং যার ক্ষতিপূরণের জন্য বা যাকে অর্থ প্রদানের জন্য উক্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে বীমা গ্রহীতা বলে। বীমাচুক্তি যে দলিল দ্বারা সম্পাদিত হয় তাকে বীমাপত্র বলা হয়।

ব্যবসার সহায়ক হিসেবে বীমা

একজন ব্যবসায়ীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ঝুঁকি নিরূপণ বা অনুধাবন। পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের বহুবিধ ঝুঁকি বিদ্যমান। যেমন, কোনো জিনিসের ভৌতিক ক্ষতি, চুরি, কর্মচারীদের পীড়া, আকস্মিক দুর্ঘটনা, আগুন, জাহাজডুবি প্রভৃতি ঘটনার কারণে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যে কোনো মুহূর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বীমা সংস্থা বীমাকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তিমাফিক প্রদত্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে এ জাতীয় ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। ব্যবসার জন্য তাই বীমা অত্যন্ত সহায়ক। বীমা সংস্থা না থাকলে ঝুঁকির আশঙ্কায় অনেক ব্যবসায়ীকেই প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের ব্যবসায় বন্ধ করে দিতে হতো।

বীমার প্রকারভেদ

বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার বীমার প্রচলন হয়েছে। এর মধ্যে চার প্রকার বীমা সর্বাধিক প্রচলিত।

১. জীবন বীমা ২. নৌ–বীমা ৩. অগ্নিবীমা এবং ৪. দুর্ঘটনা বীমা।

বর্তমানকালে মানুষ ক্রমশই বীমার সুবিধা উপলব্ধি করায় উপরিউক্ত চার প্রকার বীমা ছাড়াও আরও কয়েক শ্রেণীর বীমার প্রচলন হয়েছে। যেমন: চৌর্য বীমা, বিশ্বস্ততা বীমা, দাঙ্গা বীমা, দায়বীমা, মোটরগাড়ী বীমা, শস্য বীমা ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি বীমা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

জীবন বীমা

যে বীমা চুক্তির মাধ্যমে বীমাকারী বীমা কিস্তির বিনিময়ে বীমা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বা তার নির্বাচিত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে একটি বিশেষ সময়ের পরে বা বীমা গ্রহীতার মৃত্যুতে বীমাকৃত অর্থ প্রদান করে থাকে সে বীমা চুক্তিকেই জীবন বীমা বলে।

অগ্নিবীমা

যে বীমা চুক্তির মাধ্যমে বীমা গ্রহীতা ব্যক্তিকে অগ্নিজনিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দান করা হয় তাকে অগ্নিবীমা বলে।

নৌ–বীমা

যে বীমায় সামুদ্রিক যাত্রা থেকে সৃষ্ট ঝুঁকির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নৌ–বীমা বলা হয়।

দুর্ঘটনা বীমা

ব্যক্তির জীবন বা সম্পত্তি বিনাশের ঝুঁকি দুর্ঘটনা বীমার আওতাভুক্ত। এ জাতীয় বীমার শর্তানুসারে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের পরিবর্তে আশঙ্কিত দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি সংঘটিত হলে বীমাকারী বীমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে এ সম্পর্কিত কয়টি আইন রহিত করা হয়েছে?

ক. ৭টি
খ. ১০টি
গ. ১৫টি
ঘ. ২৫টি

২. কাজের ধরণ ও প্রকৃতির ভিত্তিতে কোনো প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত শ্রমিকগণকে ভাগ করা যায়–

ক. ২ ভাগে
খ. ৪ ভাগে
গ. ৬ ভাগে
ঘ. ৮ ভাগে

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হচ্ছে –

i. ঋণদান
ii. নির্দেশনা দান
iii. মুদ্রা প্রচলন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

সালমা বেগম অগ্রণী ব্যাংক লি: থেকে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায়ের মূলধন সংগ্রহ করেন। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে স্বল্প মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করলেও নির্দিষ্ট সময়ে তিনি তা পরিশোধ করতে সক্ষম হন।

৪. গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে ব্যাংককে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ৩টি
খ. ৪টি
গ. ৫টি
ঘ. ৬টি

৫. অগ্রণী ব্যাংক লি. কোন ধরনের ব্যাংক ?

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ. শিল্প ব্যাংক
ঘ. সমবায় ব্যাংক

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিলুফা ইয়াসমিন শাপলা গার্মেন্টস লি.–এ চাকরি করেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন কিন্তু মজুরি পান খুবই কম। এমনকি তাকে সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও কাজ করতে হয় কিন্তু শ্রম আইন অনুযায়ী বাড়তি মজুরি পান না। তার সুপারভাইজার মাঝে মাঝে তাকে বকাঝকা এবং খারাপ আচরণ করেন। এইসব কারণে কারখানার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক নেই।

ক. নিলুফা ইয়াসমিনের মতো নির্যাতিত শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন কী?

খ. অতিরিক্ত মজুরি বলতে কী বুঝ?

গ. শাপলা গার্মেন্টস লি.–এর মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকার কারণ কী?

ঘ. যদি শাপলা গার্মেন্টস লি.–এর মালিক পক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও কাজের সময় নির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে কী কী সুবিধা ও অসুবিধার সৃষ্টি হবে? ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায় ৭

ব্যবসায় পরিকল্পনা

অধ্যায় সূচি

১. ব্যবসায় পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক

২. ব্যবসায় পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়

৩. প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত উদ্দেশ্য

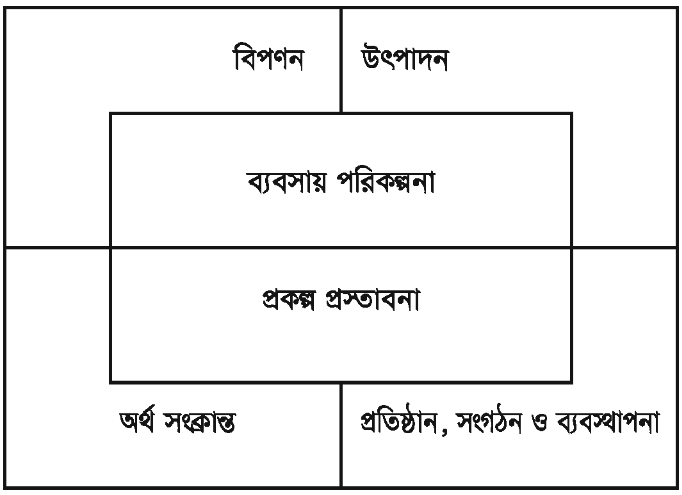
৪. প্রকল্প সম্প্রসারণ (কেইস/ ইতিবৃত্ত)

পরিকল্পনার প্রকৃতি : সাধারণ কথায় পরিকল্পনা বলতে ভবিষ্যতে কী করতে হবে তা আগে থেকেই ভেবেচিন্তে ঠিক করাকে বুঝায়। পরিকল্পনার অর্থ হল লক্ষ্য ঠিক করা এবং তা অর্জনের সব চেয়ে ভালো পথ খুঁজে বের করা। একটি ভালো পরিকল্পনা কাজের অর্ধেক সম্পন্ন করার সমান। এখানে ব্যবসায় পরিকল্পনা বলতে বুঝান হচ্ছে, ভবিষ্যতে যে ব্যবসায় করা হবে তার প্রকৃতি, পণ্য/সেবা কতটুকু এবং কীভাবে উৎপাদন এবং বাজারজাত করা হবে, এর ব্যবস্থাপনার ধরন, প্রাথমিক অর্থসংস্থান এবং লাভ-ক্ষতি কী হবে ইত্যাদি সম্পর্কে ভবিষ্যতের জন্য আজকের সিদ্ধান্তসমূহের সংকলন। সঠিক তথ্য নির্ভর এবং বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নের উপরই ভবিষ্যত ব্যবসায়ের সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে।

ব্যবসায় পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক

ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ব্যবসায়ের চারটি প্রধান দিক যথাক্রমে, বিপণন, উৎপাদন, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বিনিয়োগ সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। নিচে ছকের মাধ্যমে পরিকল্পনার প্রধান চারটি দিক সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।
প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে।
এ উপযোগ প্রধানত তিন ভাগে সৃষ্টি করা হয়।

ব্যবসায় পরিকল্পনার চারটি দিকের ছক



১. উৎপাদন পরিকল্পনা : প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। এ উপযোগ প্রধানত তিন ভাগে সৃষ্টি করা হয়। যথা–১. সময়গত ২. স্থানগত এবং ৩. রূপগত উপযোগ।

ব্যবসায় পরিকল্পনার একটি শাখা হিসেবে উৎপাদন পরিকল্পনার স্থান সর্বপ্রথম। উৎপাদন পরিকল্পনার সময় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচ্য।

–কীভাবে উৎপাদন হবে
–কতটুকু উৎপাদন হবে

–কী দিয়ে উৎপাদন হবে

–কোথায় উৎপাদন হবে

–কাকে দিয়ে উৎপাদন হবে

২. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা : উৎপাদনের উপকরণসমূহকে বিভিন্ন উৎস থেকে একত্রিত করাকে সংগঠন বলে। অন্যদিকে অধস্তনদের দ্বারা পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করিয়ে নেয়াকে ব্যবস্থাপনা বলে। সংগঠন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হস্তস্বরূপ এবং ব্যবস্থাপনা চক্ষুস্বরূপ। ব্যবসায়ের আবশ্যকীয় উপাদান সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সার্থকভাবে প্রণয়ন করতে হলে নিম্নের প্রশ্নগুলোর সমাধান হওয়া আবশ্যক।

–কীভাবে সংগঠিত করা হবে

–কীভাবে ব্যবস্থাপনা করা হবে

–কে ব্যবস্থাপনা করবে

–কীভাবে সমন্বয় করা হবে

–কীভাবে সম্প্রসারণ করা যাবে

৩. অর্থায়ন পরিকল্পনা : ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনার প্রাক্কালে অর্থের উৎস অনুসন্ধান এবং তা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিকে অর্থায়ন বলে। অর্থ একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রক্ত সঞ্চালনের সাথে তুলনীয়। অর্থায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ব্যবসায়ীকে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হয়।

–কীসে অর্থায়ন করা হবে

–কীভাবে অর্থায়ন করা হবে

–কে অর্থায়ন করবে

–কীভাবে খরচ নির্ধারণ করা হবে

–কীভাবে মুনাফা হবে

৪. বিপণন পরিকল্পনা : উৎপাদিত পণ্য উৎপাদনের স্থান হতে ক্রেতার কাছে প্রেরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলিকে বিপণন বলে। বিপণন পরিকল্পনার মধ্যে ক্রয়, বিক্রয়, অর্থায়ন, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয়া আবশ্যক।

–কী বিক্রয় করা হবে

–কার কাছে বিক্রয় করা হবে

–কতটুকু বিক্রয় করা হবে

–কত দামে বিক্রয় করা হবে

–কীভাবে বিক্রয় করা হবে

ব্যবসায় পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়

একটি তথ্য নির্ভর ও বাস্তবসম্মত ব্যবসায় পরিকল্পনায় সাধারণত নিম্নোক্ত চারটি পর্যায়/ধাপ থাকে :

১। চিহ্নিতকরণ পর্যায় : এ পর্যায়ে প্রস্তাবিত ব্যবসায় প্রকল্পের ধারণা চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের ফলাফল অনুকূলে হলে পরবর্তী পর্যায় শুরু হয়, অন্যথায় ধারণাটি বাতিল করা হয়।

২। প্রাক–নির্বাচনী পর্যায় : এ পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত প্রকল্প ধারণার প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত প্রস্তাবিত প্রকল্পের সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ এবং হুমকিসমূহ বিশ্লেষণ করা হয় এবং ফলাফল অনুকূল হলে পরবর্তী পর্যায়ের কাজ শুরু হয়।

৩। প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায় : এ পর্যায়ে বাজার সমীক্ষা, কারিগরি দিক বিশ্লেষণ ও সংগঠনের ধরন বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়।

৪. মূল্যায়ন পর্যায় : সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ফলাফল অনুকূলে হলে আর্থিক দিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য বিনিয়োগের ফলাফল/লাভ–ক্ষতি মূল্যায়ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে ফলাফল অনুকূল না হলে প্রকল্প পরিকল্পনা বাতিল করা হয় এবং ফলাফল অনুকূল হলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়।

প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত অনুশীলন

উদ্দেশ্য	:	অনুশীলন শেষে শিক্ষার্থীরা প্রকল্প প্রণয়ন করা সম্পর্কে ধারণা পাবে। প্রকল্প থেকে আয়–ব্যয়ের হিসাব করতে পারবে।
সময়	:	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট – ২ ঘণ্টা
উপকরণ	:	বোর্ড, চক/ বোর্ড মার্কার ইত্যাদি।
ধাপসমূহ	:	
ধাপ–১	:	শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ প্রকল্পের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে ভাগ হবে।
ধাপ–২	:	প্রত্যেক দল উল্লিখিত ৪টা প্রশ্নের উত্তর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বের করবে।
ক)		প্রকল্পের জন্য কত টাকা লাগবে?
খ)		প্রকল্পের জন্য কী কী উপকরণ লাগবে?
গ)		কী কী কিনতে হবে?
ঘ)		কত টাকা লাভ হবে?

শিক্ষকের করণীয়

–অনুশীলন শেষে প্রশিক্ষক নির্দিষ্ট একটি প্রকল্প নিয়ে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করবেন।

–প্রকল্পের নাম :

–প্রকল্পের জন্য টাকার পরিমাণ .... টাকা

স্থায়ী খরচ : .... টাকা

(যে খরচ ১ বছরের বেশি সময়ের জন্য হবে; যেমন, রিক্সা প্রকল্পের জন্য রিক্সার পুরোটার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ)

খরচের বিবরণ/খাত

–	:	.... টাকা
–	:	.... "
–	:	.... "
–	:	.... "
–	:	.... "
–	:	.... "

চলতি খরচ .... টাকা

(যে খরচ এক বছরের কম সময়ের জন্য হবে; যেমন, রিক্সা প্রকল্পের জন্য হারিকেনের তেল, ফিতা, মেরামত খরচ, নিজের মজুরি ইত্যাদি)

খরচের বিবরণ/খাত

–	:	.... টাকা
–	:	.... "
–	:	.... "

এক মাসে কত খরচ হবে তা বের করার জন্য স্থায়ী খরচের অবচয় বের করতে হবে। অবচয় খরচ বের করার নিয়ম হল নির্দিষ্ট যন্ত্রটি কত বছর কাজের উপযোগী থাকবে সে বছরের সংখ্যা দিয়ে যন্ত্রটির ক্রয়মূল্যকে ভাগ করলে এক বছরের খরচ বের হবে। এ পরিমাণকে ১২ দিয়ে ভাগ করলে এক মাসের অবচয় খরচ বের হবে। এ খরচের সাথে ১

মাসের গড় খরচ যোগ করলে ১ মাসের মোট খরচ বের হবে। এক মাসের সর্বমোট আয় থেকে এক মাসের মোট খরচ বাদ দিলে আসল লাভ বের হবে।

শিক্ষণীয় বিষয়

–প্রকল্প পরিকল্পনা করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ।

–প্রকল্প থেকে আয়–ব্যয়ের হিসাব বের করার পদ্ধতি জানা।

প্রকল্প সম্প্রসারণ (কেইস/ ইতিবৃত্ত) দুলাল বেকারি

আমজাদ হোসেনের বয়স যখন ১৪–১৫ তখন সে বাড়ি থেকে বের হয়ে বরিশালে একটি রুটির কারখানায় অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ নেয়। কারখানার মালিক তাকে তিনবেলা খাবার দিতেন। পারিশ্রমিক বলতে সে কিছুই পেত না। তবে, মালিক মাঝে মাঝে দু এক টাকা হাত খরচের জন্য দিতেন। আমজাদ এতেই বেশ খুশি। কেননা, বাড়িতে সে কোনোদিন দু বেলা পেট ভরে খেতে পেত না।

বেকারিতে কর্মরত অন্যান্য শ্রমিকরা আমজাদকে খুব স্নেহ করত। আমজাদ বেকারিতে কাজে ফাঁকি দিত না। মালিক তাকে খুব পছন্দ করতেন। এক বছর পরই আমজাদের বেতন নির্দিষ্ট হয় মাসে ১০০ টাকা। এটা ১৯৬৭–৬৮ সালের ঘটনা। আমজাদ ধীরে ধীরে কারখানার সমস্ত কাজ শিখে ফেলে এবং মালিকের আস্থা অর্জন করে। ১৯৭০ সালে কারখানার একজন দক্ষ শ্রমিক কারখানা ছেড়ে চলে যায়। মালিক আমজাদকে তার জায়গায় নিযুক্ত করেন।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দু জন শ্রমিক কারখানা ছেড়ে দেয়। মালিকও কারখানার দিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে পারেন না। আমজাদকে কারখানার সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করার দায়িত্বও আমজাদকে নিতে হয়। মালিক পুঁজি খাটাতে চান না। কারখানায় উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। তখন থেকেই আমজাদের স্বপ্ন সে নিজেই একটি রুটির কারখানা দিবে। এ উদ্দেশ্যেই ১৯৭৪ সালে গৌরনদী উপজেলার টোরকি বন্দরে ৬ শতাংশ জমি মাত্র এক হাজার টাকা দিয়ে কিনে রাখে।

টোরকি বন্দর একটি ব্যবসায় কেন্দ্র। এখানে নৌকা, লঞ্চ, বাস ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন ১০/১৫ হাজার লোক এ বন্দরে ব্যবসায়ের জন্য জমা হয়। শুক্র ও মঙ্গলবার সাপ্তাহিক হাটের দিন। এ দু দিন ৩০ থেকে ৪০ হাজার লোকের আনাগোনা হয় এ বন্দরে। বৃহস্পতিবার দিন গরুর হাট বসে। এ হাটটি দক্ষিণ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় গরুর হাট বলে বিবেচিত।

আমজাদ ১৯৭৮ সালে টোরকি বন্দরের পূর্বে ক্রয়কৃত জমিতে 'দুলাল বেকারি' নামে একটি বেকারি স্থাপন করে। 'দুলাল বেকারি'র জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন ছিল, তা আমজাদের ছিল না। তাই তার এক ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ৩ জন কর্মচারি রেখে দুলাল বেকারির কাজ শুরু করে।

প্রথমে আমজাদ পাউরুটি, বনরুটি ও টোস্ট বিস্কুট তৈরি করে। প্রথম দিকে দৈনিক ৩০০ কেজি ময়দার বিভিন্ন পণ্য তৈরি করতো। রুটি ও বনরুটি বাসি হলে তা খাবারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে এবং তা বিক্রি করা সম্ভব হয় না। তাই, আমজাদ অল্প পরিমাণ পণ্য তৈরি করে এবং উৎপাদিত পণ্য সম্পূর্ণ বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়।

টোরকি বন্দরে বরিশাল শহর থেকে রুটি, কেক, নানা ধরনের বিস্কুট ইত্যাদি প্রতিদিন আসতো। ইতোপূর্বে টোরকি বন্দরে কোন বেকারি ছিল না। লোকেরা আটার রুটি খেতে অভ্যস্ত ছিল। বন্দরে ১০/১২টি হোটেল আছে। এসব হোটেলে পরাটা ও চাপাতি বিক্রি হয়। আমজাদ মোরব্বা ও কিশমিশ যুক্ত বনরুটি বানায় এবং তার পাউরুটি ও বনরুটির উপরে একটি সুন্দর প্রলেপ দেয়। মিষ্টি বেশি থাকাতে তার রুটির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ রুটি খাবার জন্য অন্য কোন জিনিসের অর্থাৎ ডাল, শাকসবজির প্রয়োজন হয় না। শুধু খেতেই মজা। তাই লোকজন এটা পছন্দ করে। আমজাদ আস্তে আস্তে বাজারের অন্যান্য মনিহারি দোকান ও হোটেলে তার বেকারির পণ্যসমূহ বিক্রি করতে থাকে। তবে, দোকানদার ও হোটেলের মালিকরা তার মালের জন্য নগদ টাকা দেয় না। বাকি টাকা তুলতে আমজাদকে মাঝে মাঝে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। ইতোমধ্যে আমজাদের প্রায় পনের হাজার টাকা বাজারে বাকি পড়ে যায়।

'দুলাল বেকারি'তে একটি স্থায়ী চুলা তৈরি করার জন্য আমজাদ স্থানীয় এন.জি.ও 'সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন' (আই.এস.ডি)–এর কাছ থেকে ৫,০০০ টাকা ঋণ নেয়, যা আমজাদ সময়মতো সুদসহ পরিশোধ করে দেয়। আই.এস.ডি ১৯৮০ সাল থেকে বরিশাল জেলায় প্রান্তিক কৃষকদের মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আই.এস.ডি'র কিছু আয়মূলক প্রকল্প রয়েছে। আমজাদ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে আই.এস.ডি–তে ১৯৮৩ সালে যোগদান করে।

আমজাদ তার পণ্য বিক্রি করার জন্য বেকারি সংলগ্ন একটি শো–রুম তৈরি করে। এতে তার খরচ হয় প্রায় ৮,০০০ টাকার মতো। শো–রুম করার ফলে আমজাদের পণ্য বিক্রির মাত্রা বেড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন 'দুলাল বেকারি'র পণ্যের গুণগত মান সম্বন্ধে নিশ্চিত। আমজাদ তার পণ্যের গুণগত মান রক্ষা করার ব্যাপারে কোন সময় আপোষ করেনি। সে ভেজাল উপাদান দিয়ে মাল তৈরি করে না। আমজাদকে সবাই সৎ ব্যবসায়ী বলে জানে। আস্তে আস্তে তার বেকারি প্রসার লাভ করতে থাকে। বর্তমানে দুলাল বেকারিতে ১০ জন কর্মচারি কাজ করছে। আমজাদের মতে পাউরুটিতে লাভ তেমন হয় না, যদিও উৎপাদিত দ্রব্যের শতকরা ৫০ ভাগই হল পাউরুটি। বর্তমানে প্রতি ৪০ কেজি ময়দায় সঠিকভাবে পাউরুটি বানাতে খরচ হয় ৬২৫ টাকার মতো। অধিক খরচ হওয়ার প্রধান কারণ হল চিনি, তেল ও ডালডার দাম বৃদ্ধি। সমস্ত খরচপত্র বাদ দিয়ে ৪০ কেজি ময়দার পাউরুটিতে ১২৫ টাকা থেকে ১৩৫ টাকা লাভ থাকে। তবে বাকিতে মাল বিক্রি করতে হয় বলে লাভ তেমন থাকে না।

আমজাদ টোস্ট বিস্কুট বানায়। টোস্ট বিস্কুট বানাতে এক মণ পরিমাণ ময়দার জন্য চিনি ও ডালডা বেশি দিতে হয়। টোস্ট বিস্কুট বেশি দিন রাখা যায়। সহজে নষ্ট হয় না। এক মণ ময়দার টোস্ট বিস্কুটে ৫২ কেজি বিস্কুট হয়। মোট খরচ পড়ে ১১,১০০ টাকা। প্রতি পাউন্ড পাইকারি বিক্রি করে ২৭ টাকা দরে এবং খুচরা ৩০ টাকা দরে।

টোস্ট বিস্কুটে পাউরুটির চেয়ে মুনাফা ভালো, তবে দৈনিক এক মণের বেশি বিক্রি করা যায় না। আমজাদ কেকও বানায়। কেক বানাতে খরচ বেশি। ৪০ কেজি ময়দার মোরব্বা–কেক বানাতে খরচ হয় ৪,৮০০ টাকার মতো। ৪০ কেজি ময়দার মোরব্বা কেক বানালে ৩০০ পাউন্ডের কেক হয়। কেকের পাউন্ড পাইকারি বিক্রি হয় কুড়ি টাকা দরে এবং খুচরা চব্বিশ টাকা দরে। কেকের চাহিদা আছে বাজারে।

এ ছাড়াও আমজাদ মিষ্টি বিস্কুট তৈরি করে। একমণ ময়দায় ৯০ কেজি মিষ্টি বিস্কুট তৈরী হয়। এ বিস্কুট পাউন্ড প্রতি পাইকারি বিক্রি হয় বত্রিশ টাকায় এবং খুচরা সাঁইত্রিশ টাকায়। আমজাদের মতে তার বেকারি ব্যবসায় সফলতার বড় কারণ হচ্ছে, পণ্যের মান ঠিক রাখা। পণ্যের মান ঠিক রাখতে হলে খাঁটি জিনিসের ব্যবহার, চুলার সঠিক তাপ নিয়ন্ত্রণ এবং কারিগরের দক্ষতা অত্যাবশ্যক। আমজাদ নিজ হাতে কাজ করে। আমজাদ বেশ কিছু দিন ধরে চিন্তা করছে নতুন একটি চুলা তৈরি করার জন্য। বৈদ্যুতিক চুলা করতে অনেক টাকার প্রয়োজন। তাছাড়া বৈদ্যুতিক চুলার সমস্যা হল বিদ্যুৎ সবসময় থাকে না। চুলার ভিতর যদি পণ্য সামগ্রী থাকে এবং বিদ্যুৎ চলে যায়, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। আর সে জন্যই আমজাদ একটি নিজস্ব জেনারেটর রাখতে চায়।

১৯৯৮ সালের বন্যায় আমজাদের বেকারি প্রায় তিন মাস বন্ধ ছিল। তখন চুলার ভীষণ ক্ষতি হয়। ভালো চুলা না হলে পণ্য সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি টোরকি বাজারে নতুন আরেকটি বেকারি স্থাপিত হয়েছে। যদিও নতুন বেকারির পণ্য দুলাল বেকারির মতো নয় তথাপি বাজার সম্প্রসারণে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমজাদকে।

আমজাদ মনে করে বেকারি সম্প্রসারণের জন্য একটি ভালো চুলার প্রয়োজন। এখন কোন ধরনের চুলা তৈরি করবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব। পণ্য ভালো করতে হলে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর এর জন্য চাই সঠিক চুলা।

আমজাদ আই.এস.ডি এর কাছে ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ পাবার জন্য আবেদন করেছে। আই.এস.ডি–র কর্মকর্তারা আমজাদের এই ঋণ আবেদনকে 'প্রকল্প সম্প্রসারণের' অধীনে মূল্যায়নের পর আমজাদের কাছে বেকারি পণ্যের মোট উৎপাদন, মোট আয়, এলাকার মোট চাহিদা ইত্যাদি জানতে চেয়ে চিঠি দেয়। আমজাদ এ চিঠি পেয়ে ঋণ পাবার আশায় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তথ্যগুলো সরবরাহ করে। আই.এস.ডি কর্মকর্তারা

আমজাদের সরবরাহ করা তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখতে পায় যে ইলেকট্রিক চুলার জন্য যা ব্যয় হবে তা থেকে মুনাফা পেতে হলে আমজাদের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করতে হবে, যা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা যাবে না। আমজাদ তাই স্থির করেছে আরও একটি স্থানীয়ভাবে তৈরি চুলা বসাবে এবং দুই চুলার একটি মুখ রাখবে, তাতে লাকড়ি কম খরচ হবে এবং উৎপাদন মাত্রা ৫০% বাড়বে। (অধ্যায়ের খরচের বিবরণ উল্লিখিত সময়ের বাজার দর অনুসারে)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাধারণত ব্যবসায় পরিকল্পনার কোন পর্যায়ে প্রকল্পের দুর্বলতা, সুযোগ এবং হুমকিসমূহ বিশ্লেষণ করা যায় ?

ক. মূল্যায়ন খ. চিহ্নিতকরণ
গ. প্রাক–নির্বাচনী ঘ. প্রকল্প প্রণয়ন

২. বিপণন পরিকল্পনা করার সময় চিন্তা করতে হবে–

i. কী বিক্রয় করা হবে
ii. কতটুকু পণ্য উৎপাদন করতে হবে
iii. কীভাবে অর্থায়ন করা হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৩. ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রধান দিকগুলো হচ্ছে ?

i. উৎপাদন
ii. মূল্যায়ন
iii. বিপণন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪–৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও]

মি. লোকমান চৌধুরির ঢাকার আমারবাগ এলাকায় একটি মুদ্রণ কারখানা রয়েছে। এই ব্যবসায়ে তিনি সফলতা পেয়েছেন, তার সঠিক ব্যবসায় পরিকল্পনার জন্য। তবে কাগজ সরবরাহের বিলম্বের কারণে মাঝে মধ্যে তার ব্যবসায় বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. ব্যবসায় পরিকল্পনার শাখা হিসাবে মি. চৌধুরি সর্বপ্রথম কোনটি বিবেচনা করেছেন ?

ক. উৎপাদন খ. বিপণন
গ. সংগঠন ঘ. ব্যবস্থাপনা

৫. কাগজ সরবরাহ বিলম্বের কারণে মি. চৌধুরির ব্যবসায় পরিকল্পনার কোন অংশ প্রভাবিত হয় ?

ক. উৎপাদন খ. আর্থিক

গ. বাজারজাতকরণ ঘ. ব্যবস্থাপনা

৬. আর্থিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মি. চৌধুরি বিবেচনা করেছেন–

ক. ব্যবসায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি

খ. বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন

গ. সুলভ মূল্যে কাঁচামাল যোগান নিশ্চিতকরণ

ঘ. মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

জাকিয়া আক্তার একজন গৃহিণী। তিনি তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে চান। এজন্য ঢাকার মিরপুরে তার নিজের বাড়িতেই নকশিকাঁথা তৈরির একটি শিল্প স্থাপনের জন্য তিনি পরিকল্পনা করেছেন। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায়ের সাফল্যের বিষয়ে তিনি বেশ শঙ্কিত। তাই তিনি তার ব্যবসায়ের সফলতার জন্য ব্যবসায় শুরুর পূর্বেই সম্ভাব্যতা যাচাই করেছেন।

ক. ব্যবসায় পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ?

খ. জাকিয়া আক্তারের পরিকল্পিত শিল্পটির ধরন ব্যাখ্যা কর।

গ. জাকিয়া আক্তারের নকশিকাঁথা তৈরির ব্যবসায়ের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কী কী করণীয় হতে পারে?

ঘ. জাকিয়া আক্তারের পরিকল্পিত ব্যবসায়টির সফলতার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি কর।

অধ্যায় ৮

হিসাব রক্ষণ ও মুনাফা পরিকল্পনা

অধ্যায় সূচি

১. ভূমিকা
২. হিসাব রক্ষণের সংজ্ঞা
৩. হিসাব রক্ষণের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য
৪. হিসাব রক্ষণের গুরুত্ব
৫. হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি
৬. হিসাব চক্র
৭. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় হিসাব ও বিবরণী
৮. ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্বর্তপত্র
৯. মুনাফা পরিকল্পনা

ভূমিকা

হিসাব ব্যবসায়ের জীবন। নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে হিসাব না রাখলে ব্যবসায় টিকিয়ে রাখা কঠিন। যেসব ব্যবসায় শুরু করার কয়েক বছরের মধ্যে অকৃতকার্য হতে দেখা যায় তার অন্যতম প্রধান কারণ ব্যবসায় লেনদেনের সঠিক হিসাব না রাখা। একটি ব্যবসায় প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের আর্থিক লেন-দেন সংগঠিত হতে থাকে যা যথাসময়ে হিসাব বইয়ে বা খাতায় লিপিবদ্ধ না করলে মনে রাখা অসম্ভব এবং এ কারণে ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান, দেনা-পাওনা এবং আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এজন্য ব্যবসায়ীদের বেলায় হিসাব রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। এ অধ্যায়ে আমরা হিসাব রক্ষণের অর্থ ও গুরুত্ব, হিসাব রক্ষণের পদ্ধতি, নগদান বই, আয়-ব্যয় হিসাব, চূড়ান্ত হিসাব এবং মুনাফা পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত করব।

হিসাব রক্ষণের সংজ্ঞা : হিসাব রক্ষণ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ের আর্থিক লেন-দেন হিসাবের খাতায় বা বইয়ে লিপিবদ্ধ করা। সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে হিসাব রাখাকেই হিসাব রক্ষণ বলে। অর্থাৎ যে কলাকৌশল ও নিয়মনীতির সাহায্যে ব্যবসায়িক লেন-দেনসমূহ হিসাবের খাতায় বা বহিতে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের পর লেন-দেনের প্রকৃতি ও ফলাফল এবং সঠিক অবস্থা নিরূপণ করা যায় তাকে হিসাব রক্ষণ বলে।

হিসাব রক্ষণের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য : ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সব আর্থিক লেন-দেন সংগঠিত হয়ে থাকে সেগুলোর ফলাফল জানা প্রয়োজন। সংগঠিত লেনদেনগুলো যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং তা থেকে ফলাফল নির্ণয় হিসাব রক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। নিচে হিসাব রক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করা হল।

(ক) আর্থিক লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা : হিসাবের খাতায় বা বইতে আর্থিক লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা হিসাব রক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য।

(খ) আর্থিক লেন-দেনের ফলাফল নির্ণয় : একটি নির্দিষ্ট সময়ের আর্থিক লেন-দেনের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ের ফলাফল বা লাভ-লোকসান নির্ণয় হিসাব রক্ষণের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

(গ) আর্থিক অবস্থা নিরূপণ : ব্যবসায়ের দেনা-পাওনা, সম্পত্তি, মূলধন ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হিসাব রক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(ঘ) ব্যয় নিয়ন্ত্রণ : ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা একান্ত আবশ্যক। বিভিন্ন ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব; যেমন- বেতন, মজুরি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ দৃষ্টিতে রেখে আয় বুঝে ব্যয় করা হিসাব রক্ষণের আর একটি লক্ষ্য।

(ঙ) লেন-দেনের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই : লেন-দেন যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা তার গাণিতিক শুদ্ধতা রেওয়ামিল তৈরির মাধ্যমে যাচাই হিসাব রক্ষণের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

হিসাব রক্ষণের গুরুত্ব

হিসাব রক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কত যে বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন বনে–জঙ্গালে বাস করত এবং ফলমূল আহার এবং পশুপাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত তখন মাটিতে দাগ দিয়ে, বাকলে আঁচড় কেটে, দেয়ালে দাগ কেটে এবং আরও কিছু উপায়ে হিসাব রাখত। মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গো সঙ্গো হিসাব রক্ষণের প্রকৃতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে হিসাব রক্ষণের ভিত্তি হল দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি, যা ব্যবসায়ের জগতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। হিসাব রক্ষণের আবশ্যকতা নিচে বর্ণনা করা হল।

(ক) স্থায়ীভাবে হিসাব রক্ষণ : মানুষের স্মৃতিশক্তি যত প্রখরই হোক না কেন দীর্ঘদিন ধরে সবকিছু স্মরণ রাখা সম্ভব নয়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের বহু আর্থিক লেন–দেন সংগঠিত হয়ে থাকে। মালিক বা কর্মচারিদের পক্ষে এগুলো স্মরণ রেখে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে ব্যবসায়ের ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এটি তখনই সম্ভব যদি লেন–দেনগুলো হিসাবের খাতায় তারিখ ও পরিমাণ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে রাখা যায়। ফলে স্থায়ী ও নির্ভুল হিসাব রাখার স্বার্থে হিসাব রক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

(খ) আর্থিক ফলাফল নিরূপণ : সুষ্ঠু সুশৃঙ্খলভাবে হিসাব রক্ষণের ফলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসান ও ফলাফল নিরূপণ করা যায়।

(গ) ভুল বুঝাবুঝির অবসান : লেন–দেন লিপিবদ্ধ থাকলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পার্টির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে না। কোনো কারণে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হলে সংরক্ষিত সঠিক হিসাব প্রদর্শন করে তা নিরসন করা যায়।

(ঘ) ব্যবসায় ব্যবস্থাপনায় সাহায্য : হিসাব রক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মালিক ও ব্যবস্থাপনাকে ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। যেমন– পূর্বের হিসাবের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের বাজেট, যথা–আর্থিক ও মুনাফা বাজেট প্রণয়ন করা যায়।

(ঙ) বিভিন্ন উৎস থেকে সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হিসাব রক্ষণ : ব্যবসায় সাফল্যের সঙ্গো পরিচালনা করতে হলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য–সহযোগিতা নেয়ার প্রয়োজন পড়ে। যেমন, পুঁজির স্বল্পতা মিটানোর জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ, কাঁচামাল সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বাকিতে ক্রয়, আমদানি–রপ্তানি লাইসেন্স সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য ব্যবসায়ের লিপিবদ্ধ হিসাব একান্তভাবে প্রয়োজন।

হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি

হিসাব রক্ষণে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা কেউ নোট বইয়ে হিসাব লিখে, কেউ খাতায় লিখে, আবার কেউ সনাতন পদ্ধতির লাল মলাটের খাতায় লিখে। আধুনিক হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি বলতে দু তরফা হিসাব পদ্ধতিকে বুঝায়।

দু তরফা হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি

হিসাব রক্ষণের যে পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেকটি লেন–দেনের দ্বৈত সত্তা এবং যুগপৎ দুটি পক্ষের সমপরিমাণ টাকায় একটিকে ডেবিট এবং অপরটিকে ক্রেডিট করে হিসাব রাখা হয় তাকে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলা হয়। লেন–দেনের দ্বৈত সত্তা বলতে হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিককে বুঝায়। আর্থিক লেন–দেনের দুটি পক্ষ থাকে—এক পক্ষ প্রাপক বা গ্রহীতা এবং অন্য পক্ষ দাতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, জনাব করিমকে ২০০ টাকা দেয়া হল। এখানে করিম গ্রহীতা পক্ষ এবং ব্যবসায়ের নগদান হিসাব দাতাপক্ষ। দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের জাবেদা বহিতে এভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে :

	ডেবিট টাঃ	ক্রেডিট টাঃ
করিম হিসাব ডেটর	২০০/–	–
টু নগদ হিসাব–	–	২০০/–

প্রকৃত পক্ষে যে হিসাব রক্ষণ ব্যবস্থায় প্রতিটি লেন–দেনের একই সাথে দুটি হিসাব খাতকে ডেবিট ও ক্রেডিট করা হয় এবং সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়ের সঠিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা যায় তাকে দু তরফা হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি বলে।

হিসাব চক্র

দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি অবিরাম প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এর ধারা অনুযায়ী হিসাব প্রক্রিয়া চক্রাকারে অবিরাম চলতে থাকে। এ পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণের কাজ শুরু হয় লেন-দেন জাবেদাকরণের মাধ্যমে এবং পুনরায় জাবেদাতে এসে কাজটি শেষ হয়। এভাবে চক্রাকারে ধারাবাহিকভাবে হিসাবের কাজ চলতে থাকে বলে একে হিসাব চক্র বলা হয়। হিসাব চক্রকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। যথা:

১। জাবেদাকরণ (লিপিবদ্ধকরণ)
২। খতিয়ান ভুক্তি (শ্রেণীবদ্ধকরণ)
৩। রেওয়ামিল তৈরি (সংক্ষিপ্তকরণ)
৪। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত (চূড়ান্তকরণ)
৫। আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ (অনুপাত বিশ্লেষণ)

১। জাবেদাকরণ (Journal)

ব্যবসায় সংগঠিত লেনদেনগুলো বহিতে লিপিবদ্ধ করার কাজকে জাবেদাকরণ বলে। এটি হিসাব চক্রের প্রথম স্তর। জাবেদা বইগুলোর মধ্যে ক্রয় বই, বিক্রয় বই, ক্যাশ বই, বিল প্রাপ্তি বই, বিল প্রদেয় বই অন্যতম।

২। খতিয়ানভুক্তি (Ledger)

জাবেদায় রেকর্ডভুক্ত লেনদেনসমূহকে প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত করে খতিয়ানে স্থানান্তর করে জের বের করাই খতিয়ানভুক্তি। এটি হিসাব চক্রের দ্বিতীয় স্তর। লেজারে বিভিন্ন ধরনের হিসাব যেমন মূলধন হিসাব, ব্যাংক হিসাব, বেতন হিসাব, ক্রয় হিসাব, বিক্রয় হিসাব, আসবাবপত্র হিসাব, কমিশন হিসাব ইত্যাদি রাখা হয়।



হিসাব চক্র

৩। রেওয়ামিল (Trial Balance)

হিসাব চক্রের তৃতীয় স্তরে প্রতিটি হিসাবের জের নিয়ে রেওয়ামিল তৈরি করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল হিসাবের গাণিতিক বিশুদ্ধতা যাচাই করা। ভুল না থাকলে রেওয়ামিলের দু দিক সমান হয়ে থাকে।

৪। আর্থিক বিবরণী তৈরি (Financial Statement)

ব্যবসায় আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানার জন্য রেওয়ামিল ও সমন্বয়ে উল্লিখিত তথ্য থেকে এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্বর্ত পত্র তৈরি করা হয়।

৫। আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ (Analysis of Financial Statement)

হিসাব চক্রের এ পর্যায়ে ব্যবসায়ে অর্জিত সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করা হয়। বিশ্লেষণের তথ্য থেকে ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ ব্যবসায় সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। এ পর্যায়ে আর্থিক বিবরণীর অনুপাত বিশ্লেষণ ও সম আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় হিসাব ও বিবরণী

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণ ব্যয়সাধ্য ও কঠিন। তবে সুষ্ঠু হিসাব রক্ষণের স্বার্থে এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখা ভালো। নিচে আধুনিক পদ্ধতিতে কীভাবে প্রয়োজনীয় হিসাব রক্ষণ করা যায় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

ক্যাশ বই : যে বইয়ে ব্যবসায় নগদ লেন-দেন সুশৃঙ্খলভাবে রেকর্ড করা হয় তাকে ক্যাশ বই বলে। ছোট ব্যবসায়ের জন্য ক্যাশ প্রাপ্তি ও প্রদানের হিসাব যথাযথভাবে রক্ষণের গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি ব্যবসায় বছরের শেষে লোকসান করলেও চলতে পারে কিন্তু নগদ প্রবাহের আকাঙ্ক্ষিত ধারা বিঘ্নিত হলে এর অস্তিত্ব লোপ পেতে পারে।

নগদ প্রাপ্তি ও নগদে প্রদান নগদান বইয়ে রেকর্ড করা হয়। অতীতের বাকি ক্রয়ের দেনা নগদে পরিশোধ এবং বাকি বিক্রয়ের পাওনা নগদে পাওয়া গেলে ক্যাশ বইয়ে লিখতে হয়। দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে গ্রাহকের কাছ থেকে চেকের

মাধ্যমে পেমেন্ট পাওয়া গেলে ক্যাশ বইয়ে লেখা হয়। চেকের টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করলে এবং নগদ টাকা ব্যাংকে জমা দিলে এগুলো ক্যাশ বইতে লিখতে হয়। প্রকৃতপক্ষে নগদ প্রাপ্তি ক্যাশ বইয়ের বাম পাশের পৃষ্ঠায় জমার পাতায় এবং নগদ প্রদান ডান পাশের পৃষ্ঠায় খরচের পাতায় লিখতে হয়। ক্যাশ বইয়ের উপরে যে বছরের হিসাব তা লিখে রাখতে হয়। যে মাসের জন্য ক্যাশ বই তৈরি করা হয় সে মাসের নামও লিখতে হয়। ক্যাশ বই দু ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক অংশে তারিখ, বিবরণ, ভাউচার নং, লেজার নং এবং টাকার পরিমাণ লেখার কলাম থাকবে। তারিখের কলামে লেন–দেনের তারিখ, বিবরণ কলামে কোন খাতে জমা ও খরচ তা লিখতে হয়।

ভাউচার (Voucher)

লেন–দেনের প্রমাণ পত্র হল ভাউচার এবং আইনানুগ গ্রহণযোগ্য দলিল। কোনো দোকান থেকে কিছু কিনলে যে ক্যাশমেমো দেয়া হয় তাই ভাউচার। ভাউচারে ১ থেকে ক্রমিক নম্বর দিতে হয় এবং তা সংরক্ষণ করতে হয়। ভাউচার নম্বর ক্যাশ বইয়ের ভাউচার কলামে লিখতে হয়। বেতনের জন্য ভিন্ন ভাউচারের প্রয়োজন হয় না। হাজিরা খাতায় প্রাপকের স্বাক্ষরসহ লিখে রাখলেই চলে। ব্যাংকে জমার রসিদ আর চেকের উপর আলাদা নম্বর দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তবে এগুলো আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হয়।

খতিয়ান (Ledger)

লেজার বা খতিয়ান হল বিভিন্ন নামের হিসাব রক্ষণের পাকা বই। ক্যাশ বইয়ের লেজার নম্বর হল লেজারের যে পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট হিসাব লেখা হয় সে পৃষ্ঠা নম্বর। লেন–দেন সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশ বইয়ে লিখতে হয়। একই এন্ট্রি আবার লেজার বইয়ে লিখতে হয়। এতে সুবিধা এই যে ক্যাশ বই দেখে জানা যায় লেজারের কত পৃষ্ঠায় এ হিসাবটি লেখা আছে। আর নম্বর দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় এন্ট্রিটি লেজারে লেখা হয়েছে কিনা।

পরবর্তীতে টাকার ঘরে প্রয়োজনীয় অংকটা লিখতে হয়। নির্দিষ্ট সময় বা মাসের শেষে দু পাশের অংশ যোগ করে নগদান বইয়ের জের বের করতে হয়। লক্ষ রাখতে হবে যে একঘরা নগদান বইয়ের বেলায় খরচের মোট অংশ কখনই জমার মোট অংকের চেয়ে যেন বেশি হতে না পারে। যদি মাসান্তে জমার পরিমাণ খরচের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় তাহলে তা নগদান বইয়ের ডেবিট পাশে উদ্বৃত্ত তহবিল। পরের মাসের নগদান বইয়ে তা প্রারম্ভিক নগদান হিসাবে দেখানো হয়। নগদান বই একদিকে জাবেদা বই আবার অন্যদিকে খতিয়ানভুক্ত হিসাব। প্রারম্ভিক তহবিল খতিয়ানভুক্ত হিসাবে ডেবিট দিকে লিখতে হবে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেয়া গেল :

জনাব জামালের নিম্নলিখিত লেন–দেনগুলো নগদান বইতে লিপিবদ্ধ কর।

১৯৯৯ সাল

এপ্রিল	১	হাতে নগদ	–	–	–	–	২০০০.০০	টাকা
”	১	রহিমের কাছ থেকে পাওয়া গেল	–	–	–	–	১৫০০.০০	”
”	২	নগদে বিক্রয়	–	–	–	–	২৫০০.০০	”
”	৩	নগদে মাল ক্রয়	–	–	–	–	২২০০.০০	”
”	৩	বেতন প্রদান	–	–	–	–	২৫০০.০০	”
”	৪	ঘর ভাড়া পরিশোধ	–	–	–	–	১০০০.০০	”
”	৬	করিমের কাছে নগদে বিক্রয়	–	–	–	–	৪০০০.০০	”
”	৮	শামীমের কাছ থেকে নগদে ক্রয়	–	–	–	–	৫০০০.০০	”
”	১০	ব্যাংক থেকে উত্তোলন	–	–	–	–	৩০০০.০০	”
”	১২	যাতায়াত বাবদ খরচ	–	–	–	–	৫০০.০০	”
”	১৫	নগদে বিক্রয়	–	–	–	–	২৫০০.০০	”
”	১৬	কাশেমকে প্রদান	–	–	–	–	৫০০.০০	”
”	২০	রহিমের কাছ থেকে প্রাপ্তি	–	–	–	–	২৮০০.০০	”
”	২০	নগদে ক্রয়	–	–	–	–	১৫০০.০০	”
”	২২	নগদে ক্রয়	–	–	–	–	১২০০.০০	”
”	২৫	বেতন প্রদান	–	–	–	–	৬০০০.০০	”
”	৩০	নগদে বিক্রয়	–	–	–	–	২৫০০.০০	”

নগদান বইয়ের ছক

জামালের নগদান বই; এপ্রিল, ১৯৯৯

ডেবিট **ক্রেডিট**

তারিখ	বিবরণ	ভাউচার নং	লেজার	টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভাউচার নং	লেজার	টাকা
১	টু প্রারম্ভিক তহবিল	–	–	২০০০.০০	৩	বই ক্রয় হিঃ	–	–	২২০০.০০
”	” রহিম হিসাব	–	–	১৫০০.০০	৩	বেতন হিসাব	–	–	২৫০০.০০
২	” বিক্রয় হিসাব	–	–	২৫০০.০০	৪	ঘর ভাড়া হিঃ	–	–	১০০০.০০
৬	” বিক্রয় হিসাব	–	–	৪০০০.০০	৮	ক্রয় হিসাব	–	–	৫০০০.০০
১০	” ব্যাংক হিসাব	–	–	৩০০০.০০	১২	যাতায়াত হিসাব	–	–	৫০০.০০
১৫	” বিক্রয় হিসাব	–	–	২৫০০.০০	১৬	কাশেম হিসাব	–	–	৫০০.০০
২০	” রহিম হিসাব	–	–	২৮০০.০০	২০	ক্রয় হিসাব	–	–	১৫০০.০০
৩০	” বিক্রয় হিসাব	–	–	২৫০০.০০	২২	ক্রয় হিসাব	–	–	১২০০.০০
					২৫	বেতন হিসাব	–	–	৬০০০.০০
						” ব্যালেন্স সি/ডি	–	–	৪০০.০০
				২০,৮০০.০০					২০,৮০০.০০
১ মে ১৯৯৯	টু–ব্যালেন্স বি/ডি			৪০০.০০					

১লা মে টু ব্যালেন্স সি/ডি ৪০০.০০

ক্রয়–বিক্রয় হিসাব,

লাভ–লোকসান হিসাব ও উদ্বর্তপত্র

সারা বছরব্যাপী ক্রয়–বিক্রয়ের ফলে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কত লাভ বা লোকসান হল এবং সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাণ কত তা জানতে চান। এজন্য তাকে বছরের জন্য ক্রয়–বিক্রয় হিসাব লাভ–লোকসান হিসাব এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখে উদ্বর্তপত্র প্রস্তুত করতে হবে। যদি নগদান বই ও লেজার নিয়মিত যথাযথভাবে লেখা হয়ে থাকে তবে ক্রয়–বিক্রয় ও লাভ–লোকসান হিসাব এবং ব্যালেন্সশিট তৈরি করা কঠিন নয়। আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী হিসাবের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করেন। রেওয়ামিলে প্রদত্ত তথ্য থেকে ব্যবসায়ের ক্রয়–বিক্রয় হিসাব, লাভ–লোকসান হিসাব এবং উদ্বর্তপত্র তৈরি করা যায়। কীভাবে এসব বিবরণী প্রস্তুত করা যায় তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা যায়।

উদাহরণ

জনাব হাসিবুল কাইয়ুমের নিম্নলিখিত রেওয়ামিল থেকে ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের ক্রয়-বিক্রয় হিসাব ও লাভ-লোকসান হিসাব প্রস্তুত এবং উক্ত তারিখে ব্যবসার একটি উদ্বর্তপত্র তৈরি কর।

জনাব কাইয়ুম
রেওয়ামিল
১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
	টাকা	টাকা
মূলধন	–	৫০,০০০.০০
উত্তোলন	১৩,০০০.০০০	–
মজুদ (১–১–৯৯)	১০,০০০.০০০	–
ক্রয়	২৩,০০০.০০	–
ক্রয় ফেরত	–	৩,০০০.০০
বিক্রয়	–	৩০,০০০.০০
বিক্রয় ফেরত	৩,০০০.০০	–
মজুরি	১,৫০০.০০	–
দেনাদার	৫,০০০.০০	–
পাওনাদার	–	২,০০০.০০
পরিবহন	৫,০০০.০০	–
বেতন	২,৫০০.০০	–
বাড়িভাড়া	২,৩০০.০০	–
বীমা সেলামি	১,৪০০.০০	–
বিজ্ঞাপন খরচ	১,৩০০.০০	–
আসবাবপত্র	৫,০০০.০০	–
সাজসরঞ্জাম	৪,০০০.০০	–
হাতে নগদ	২,০০০.০০	–
ব্যাংকে জমা	৬,০০০.০০	–
	৮৫,০০০.০০	৮৫,০০০.০০

সমন্বয় : সমাপনী মজুদ ২০,০০০ টাকা

সমাধান :

জনাব হাসিবুল কাইয়ুম
১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের ক্রয়–বিক্রয় এবং লাভ–লোকসান হিসাব

ডেবিট **ক্রেডিট**

বিবরণ		পরিমাণ	বিবরণ		পরিমাণ
টু মজুদ (১–১–৯৯)		১০,০০০.০০	বাই বিক্রয়	৩০,০০০.০০	–
" ক্রয়	২৩,০০০.০০		বাদ ফেরত (–)	৩,০০০.০০	২৭,০০০.০০
বাদ ফেরত (–)	৩,০০০.০০	২০,০০০.০০	সমাপনী মজুদ		২০,০০০.০০
" মজুরি		১,৫০০.০০			
" পরিবহণ		৫,০০০.০০			
" মোট লাভ (লাভ লোকসান হিসাবে স্থানান্তরিত		১০,৫০০.০০			
		৪৭,০০০.০০			৪৭,০০০.০০
টু বেতন		২,৫০০.০০	বাই মোট লাভ (ক্রয়–বিক্রয় হিসাব থেকে স্থানান্তরিত)		১০,৫০০.০০
" বাড়ি ভাড়া		২,৩০০.০০			
" বীমা সেলামী		১,৪০০.০০			
" বিজ্ঞাপন খরচ		১,৩০০.০০			
" নীট লাভ (মূলধন হিসাবে স্থানান্তরিত)		৩,০০০.০০			
		১০,৫০০.০০			১০,৫০০.০০

জনাব হাসিবুল কাইয়ুম
উদ্বর্তপত্র
১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে

দায়সমূহ		পরিমাণ (টাকা)	সম্পদ	পরিমাণ (টাকা)
পাওনাদার		২,০০০.০০	হাতে নগদ	২,০০০.০০
মূলধন	৫০,০০০.০০		ব্যাংকে জমা	৬,০০০.০০
যোগ নীট লাভ	৩,০০০.০০		দেনাদার	৫,০০০.০০
	৫৩,০০০.০০			
বাদ উত্তোলন	১৩,০০০.০০	৪০,০০০.০০	সমাপনী মজুদ	২০,০০০.০০
			আসবাবপত্র	৫,০০০.০০
			সাজসরঞ্জাম	৪,০০০.০০
		৪২,০০০.০০		৪২,০০০.০০

মুনাফা পরিকল্পনা

ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। অগ্রগতি ও টিকে থাকার জন্য মুনাফা অর্জন একান্তভাবে অপরিহার্য। এ জন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ীর উচিত তার ব্যবসায়ের জন্য একটি মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা করা। পরিকল্পনাবিহীনভাবে ব্যবসায় চালালে ব্যবসায়ের কাঙ্ক্ষিত লাভ অর্জন সম্ভব হতে পারে আবার নাও হতে পারে। তাই ব্যবসায়ের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

মুনাফা এমনিতে অর্জিত হয় না। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। মুনাফা বলতে ব্যবসায়ের আয়-ব্যয়ের ব্যবধানকে বুঝায়। পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে লক্ষ্য স্থির করে উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মসূচি বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ব্যবসায় শুরুর দিকে মুনাফা কম হতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে যেমন উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে, বিক্রয়লব্ধ আয় বাড়িয়ে, উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে এর জন্য প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন।

মুনাফা বৃদ্ধি করার যেসব কৌশল প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে ব্যয়-পরিমাণ-মুনাফা সম্পর্ক বিশ্লেষণ অন্যতম। এ বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অনেকটা সহজ। আমরা জানি, উৎপাদনের বা ব্যবসায়ের ব্যয়কে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : প্রত্যক্ষ ব্যয় ও পরোক্ষ ব্যয়। অন্যভাবে ব্যয়সমূহকে পরিবর্তনশীল ব্যয় ও স্থায়ী ব্যয় হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। বিক্রয় ও উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হলেও স্থায়ী ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু পরিবর্তনশীল ব্যয় বিক্রয় ও উৎপাদনের সাথে সমানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বুঝানো যেতে পারে। মনে কর, একটি জুতার দোকানে প্রতি সপ্তাহে ১,০০০ জোড়া জুতা বিক্রয় হয়। প্রতি জোড়া ৮০ টাকা হারে ১,০০০ জোড়া জুতার ক্রয় মূল্য দাঁড়ায় ৮০,০০০ টাকা। দোকান ভাড়া, কর্মচারি ও বিদ্যুৎ খরচ বাবদ সপ্তাহে ঐ দোকানে স্থায়ী খরচের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা। স্থায়ী খরচসহ প্রতি জোড়া জুতার ক্রয় মূল্য পড়ে ৯০ টাকা। ফলে ১০০০ জোড়া জুতার মোট ক্রয় মূল্য ৯০,০০০ টাকা। যদি প্রতি জোড়া জুতার বিক্রয় মূল্য ১০০ টাকা হয় তাহলে সপ্তাহে বিক্রয়লব্ধ অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ১,০০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে সপ্তাহে অর্জিত মুনাফার পরিমাণ হবে (১,০০,০০০-৯০,০০০)=১০,০০০ টাকা অর্থাৎ জোড়া প্রতি মুনাফা ১০ টাকা। যদি সপ্তাহে ১০২০ জোড়া জুতা বিক্রয় করা যায় তাহলে মুনাফা কত হবে? অতিরিক্ত ২০ জোড়া জুতার মূল্য (২০x৮০ টাকা) ১,৬০০ টাকা। সুতরাং ১০২০ জোড়া জুতার ক্রয় মূল্য হবে (১০২০x৮০ টাকা) ৮১,৬০০ টাকা + ১০,০০০ = ৯১,৬০০ টাকা। প্রতি জোড়া জুতার বিক্রয় মূল্য ১০০ টাকা হিসাবে ১০২০ জোড়া জুতার বিক্রয় মূল্য হবে ১,০২,০০০ টাকা। এতে সপ্তাহে মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াবে (১,০২,০০০-৯১,৬০০) = ১০,৪০০ টাকা। ফলে জোড়া প্রতি মুনাফার পরিমাণ হবে প্রায় ১০ টাকা ২০ পয়সা।

এখানে লক্ষ করা প্রয়োজন বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়লেও স্থায়ী খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি।, কারণ ২০ জোড়া জুতা বেশি বিক্রি হলে দোকান ভাড়া, বিদ্যুৎ খরচ ও কর্মচারির বেতন একই থাকবে। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিসরে উৎপাদন বা বিক্রয়ের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে সাধারণত স্থায়ী খরচের পরিমাণের পরিবর্তন হয় না। উৎপাদন বা বিক্রয় যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে একক প্রতি পণ্যের উপর স্থায়ী ব্যয় ততই হ্রাস পেতে থাকে। অপরদিকে উৎপাদনের বা বিক্রয়ের পরিমাণ কমতে থাকলে স্থায়ী ব্যয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে পরিবর্তনশীল ব্যয় সমানুপাতিক হারে বেড়ে চলে। একজন শিল্পোদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী ব্যয়-পরিমাণ-মুনাফার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে। মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

সম আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ (Break Even Analysis)

সম আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ বলতে ব্যবসায়ের এমন একটি অবস্থাকে নির্দেশ করে যে অবস্থায় আয়-ব্যয় সমান হয়। একে সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণও বলা হয়ে থাকে। অন্য কথায় বলা যায় এটি ব্যবসার এমন একটি পর্যায় যখন লাভ ও হয় না, ক্ষতিও হয় না। আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করলে মোট বিক্রয় মূল্য মোট ব্যয়ের সমপরিমাণ হবে তাকে সম আয়-ব্যয় বলে।

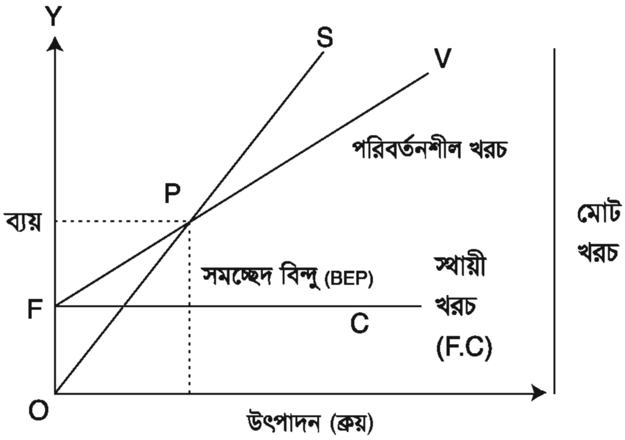
যে বিন্দুতে পণ্য বিক্রয় করলে আয় ও ব্যয় সমান হয় তাকে সম আয়-ব্যয় বিন্দু (Break Even Point) বলে। সুতরাং সম আয়-ব্যয় বিন্দু বলতে উৎপাদন বা বিক্রয়ের এমন একটি পরিমাণকে বুঝায়, যা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের লাভও বুঝায় না, লোকসানও বুঝায় না।

সম আয়–ব্যয় বিন্দু জানা থাকলে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনের আশায় পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ, বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সর্বোপরি মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়।

সম আয়–ব্যয় বিশ্লেষণের জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় উপাত্তের মধ্যে স্থায়ী ব্যয়, একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়, একক প্রতি বিক্রয় মূল্য, বিক্রয়কৃত পণ্যের পরিমাণ, ক্রয়কৃত ও উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ প্রভৃতি প্রধান। প্রয়োজনীয় উপাত্ত পাওয়া গেলে সম আয়–ব্যয় বিশ্লেষণের সাহায্যে সম আয়–ব্যয় বিন্দু বের করা যায়। সম আয়–ব্যয় বিন্দু বের করার সূত্র হলো :

$$\text{সম আয়–ব্যয় বিন্দু} = \frac{\text{মোট স্থায়ী ব্যয় (FC)}}{\text{একক বিক্রয় মূল্য (SP)} - \text{একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় (UVC)}}$$

চিত্র :



সমচ্ছেদ বিন্দু/সম আয়–ব্যয় বিন্দু

FC=Fixed Cost
SP=Selling Price
UVC=Unit Variable Cost

ব্যাখ্যা : সম আয়–ব্যয় বিন্দু বা সমচ্ছেদ বিন্দু চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। এখানে তেমনি একটি চিত্র দেয়া হয়েছে। এখানে–

OX রেখা=উৎপাদন
OY রেখা=ব্যয়
FC রেখা=স্থায়ী খরচ (Fixed Cost)
FV বিন্দু=পরিবর্তনশীল খরচ(Variable Cost)
S রেখা=মোট বিক্রয় (Total Sales)
P বিন্দু=সমচ্ছেদ বিন্দু/সম আয়–ব্যয় বিন্দু

চিত্রে বিক্রয় রেখার যে বিন্দুতে খরচ রেখা ছেদ করেছে (P বিন্দু) সেটিই হল সমচ্ছেদ বিন্দু বা সম আয়–ব্যয় বিন্দু।

উদাহরণ–১

জনাব আবদুল বাতেন একজন দক্ষ পিজা প্রস্তুতকারক। সে হিসাব করে দেখেছে একটি বড় সাইজের পিজা প্রস্তুত করতে খরচ পড়ে ৪০ টাকা যা বর্তমানে বাজারে ৫০ টাকায় বিক্রয় করা সম্ভব। পিজা বিক্রয় করার জন্য সে যে দোকান ভাড়া নেবে তাতে ব্যয় হবে ৫,০০০ টাকা। সম আয়–ব্যয় অবস্থার জন্য কয়টি পিজা বিক্রয় করতে হবে?

উত্তর : এ অঙ্কে নিম্নোক্ত উপাত্তগুলো বিদ্যমান

একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়	= ৪০ টাকা
মোট স্থায়ী ব্যয়	= ৫,০০০ টাকা
একক প্রতি বিক্রয় মূল্য	= ৫০ টাকা

সূত্র অনুযায়ী :

$$\text{সম আয়–ব্যয় বিন্দু} = \frac{৫,০০০}{৫০-৪০}$$

$$= \frac{৫,০০০}{১০}$$

$$= ৫০০$$

উত্তর = ৫০০ টি পিজা

উদাহরণ–২

নিচে শামীম এন্টারপ্রাইজের ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হলো। তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে সম আয়–ব্যয় বিন্দু বের কর।

প্রতিটি পণ্যের বিক্রয় মূল্য	=	৫ টাকা
মোট স্থায়ী ব্যয়	=	১০,০০০ টাকা
পরিবর্তনশীল একক পণ্যের ব্যয়	=	৩ টাকা

সূত্র অনুসারে :

$$\text{সম আয়–ব্যয় বিন্দু} = \frac{\text{মোট স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক বিক্রয় মূল্য (–) একক পরিবর্তনশীল ব্যয়}}$$

$$\text{মান বসিয়ে} = \frac{১০,০০০}{৫-৩}$$

$$= \frac{১০,০০০}{২}$$

= ৫,০০০ ইউনিট।

যদি শামীম স্থায়ী খরচের উপর ৪০% মুনাফা অর্জন করতে চায় তাহলে মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,০০০ টাকা। কাঙ্ক্ষিত মুনাফা ৪,০০০ টাকা অর্জন করতে কত ইউনিট মাল বিক্রয় করা প্রয়োজন?

$$\text{সূত্র} = \frac{\text{স্থায়ী খরচ + কাঙ্ক্ষিত মুনাফা}}{\text{একক বিক্রয় মূল্য–একক প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ}}$$

$$\text{মান বসিয়ে} = \frac{১০,০০০ + ৪,০০০}{৫-৩}$$

$$= \frac{১৪,০০০}{২}$$

= ৭,০০০ ইউনিট।

৪,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করতে হলে প্রতি ইউনিট ৫ টাকা হিসেবে ৭,০০০ ইউনিট বিক্রয় করতে হবে।

যদি এমন হয়, ৬,৫০০ ইউনিট বিক্রয় করে ৪,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করতে হবে, তাহলে একক টাকা প্রতি বিক্রয় মূল্য কত নির্ধারণ করা যেতে পারে?

$$\text{বিক্রয় মূল্য} = \frac{\text{স্থায়ী ব্যয়+কাঙ্ক্ষিত মুনাফা}}{\text{বিক্রয়ের পরিমাণ (ইউনিট)}}$$

$$\text{মান বসিয়ে} = \frac{১০,০০০ + ৪,০০০}{৬,৫০০}$$

$$= \frac{১৪,০০০}{৬,৫০০}$$

= ২.১৫ টাকা।

তা হলে প্রতিটি পণ্যের বিক্রয় মূল্য = ২.১৫ + ৩.০০ = ৫.১৫ টাকা।

প্রতিটি পণ্য ৫ টাকার পরিবর্তে ৫.১৫ টাকায় বিক্রয় করতে পারলে ৪,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করা যাবে।

উপসংহারে এ কথা বলা যায় যে, একজন শিল্পোদ্যোক্তা সম আয়–ব্যয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি বা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখার বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ পূর্বেই স্থির করে ব্যবসায়ের কাজ পরিচালনা করতে পারে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. হিসাবরক্ষণের মূল ভিত্তি কী ?

ক. জাবেদা খ. খতিয়ান

গ. ক্যাশ বই ঘ. লেনদেন

২. সম আয়–ব্যয় বিশ্লেষণ মুনাফা পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। নিচের কোনটি সম আয়–ব্যয় বিন্দুর সূত্র ?

i. $\frac{\text{ক্রয় মূল্য + বিক্রয় মূল্য}}{\text{নীটমূল্য}}$

ii. $\frac{\text{ক্রয় মূল্য + বিক্রয় মূল্য}}{\text{মোট মূল্য x নীট মূল্য}}$

iii. $\frac{\text{মোট স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক বিক্রয় মূল্য – একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়}}$

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

জনাব আলী একজন ব্যবসায়ী। তিনি প্রতিদিন নগদে ও বাকিতে লেন-দেন করেন এবং দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখেন। তিনি বছর শেষে ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করেন।

৩. ব্যবসায়ের জীবন কোনটি ?

ক. দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি খ. হিসাব

গ. মূলধন ঘ. ক্রয় ও বিক্রয়

৪. হিসাব রক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য কী ?

ক. হিসাব রাখা খ. লেনদেনগুলো সংরক্ষণ করা

গ. ক্রয় বিক্রয় করা ঘ. আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা

সৃজনশীল প্রশ্ন :

জনাব হাসান একজন ব্যবসায়ী। তিনি দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করেন। ব্যবসায়ের নগদ লেনদেনগুলো তারিখের ক্রমানুসারে তিনি নগদান বইয়ে সংরক্ষণ করেন। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে তার ব্যবসায় নিম্নলিখিত লেন-দেনগুলো সম্পন্ন হয় :

২০০৬ সালের	জানুয়ারি	১	হাতে নগদ	২০,০০০/–
”	জানুয়ারি	২	নগদে বিক্রয়	১,৫০০/–
”	জানুয়ারি	৪	নগদে মাল ক্রয়	২,০০০/–
”	জানুয়ারি	৫	বেতন প্রদান	২,৫০০/–
”	জানুয়ারি	৮	ব্যাংক থেকে উত্তোলন	৩,০০০/–
”	জানুয়ারি	১৫	বাবরকে নগদ প্রদান	৫০০/–
”	জানুয়ারি	২৫	হামিদের কাছ থেকে প্রাপ্তি	২,৮০০/–
”	জানুয়ারি	৩০	ঘর ভাড়া পরিশোধ	১,০০০/–

ক. ক্যাশ বই কী?

খ. ব্যবসায়ের ক্যাশ বই গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

গ. জনাব হাসানের উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো নগদান বইতে লিপিবদ্ধ কর।

ঘ. নগদান বইয়ের ক্রেডিট ব্যালেন্স না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায় ৯

উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ

অধ্যায় সূচি :

১. খরচের প্রকারভেদ
২. ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য নিরূপণ
৩. উৎপাদন ব্যয় বিবরণী
৪. উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য
৫. বিভিন্ন খরচের ব্যাখ্যা
৬. অনুশীলন
৭. অনুশীলনের ধাপসমূহ
৮. শিক্ষকের করণীয়
৯. প্রশ্নাবলি

ব্যবসার প্রধান উপাদান হল এর পণ্য বা দ্রব্য। সাধারণ কেনা–বেচা ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং উৎপাদন ব্যবসায়ের বেলায় উৎপাদন ব্যয়ের কথা জানি। যে কোন ব্যবসায়ীর জন্য পণ্যের যথার্থ ক্রয় মূল্য ও উৎপাদন ব্যয় যথাযথভাবে নির্ধারণ করা আবশ্যক। কারণ এর উপর ভিত্তি করেই বিক্রয় মূল্য নিরূপণ করা হয়। ব্যবসায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং উৎপাদন ব্যয় নিরূপণের কাজ আগেই সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে ক্রয় মূল্য ও উৎপাদন ব্যয় এবং বিক্রয় মূল্য নিরূপণ পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

খরচের প্রকারভেদ : খরচ দুই প্রকার যথা–

১। প্রত্যক্ষ খরচ (Direct Cost)

২। পরোক্ষ খরচ (Indirect Cost)

১। প্রত্যক্ষ খরচ : যে খরচ পণ্য ক্রয় বা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত এবং ক্রয়কৃত পণ্য বা উৎপাদিত দ্রব্যের উপর সহজে আরোপ করা যায় তাকে প্রত্যক্ষ খরচ বলে। যেমন, পণ্য–ক্রয়, পণ্যের পরিবহন খরচ, ইত্যাদি।

২। পরোক্ষ খরচ : যে খরচ পণ্য ক্রয় খরচ বা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় এবং ক্রয়কৃত পণ্য বা উৎপাদিত দ্রব্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে আরোপ করা যায় না তাকে পরোক্ষ খরচ বলে। যেমন–ঘরভাড়া, বেতন, কমিশন, স্টেশনারি, অফিস খরচ, মেরামত খরচ, টেলিফোন বিল ইত্যাদি।

ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য নিরূপণ

কেনা–বেচা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সাধারণত ক্রয়কৃত পণ্যের জন্য যে দাম দেয়া হয় তাকেই ক্রয় মূল্য বলে। প্রকৃত অর্থে পণ্যের দাম এবং পণ্য কিনে বিক্রয় স্থলে বা দোকানে পৌঁছানো পর্যন্ত খরচ ক্রয় মূল্যের অন্তর্ভুক্ত। ফলে ক্রয়কৃত পণ্যের দামের সাথে মালের পরিবহন খরচ, কুলি খরচ ইত্যাদি যোগ করে ক্রয় মূল্য নিরূপণ করা হয়।

ক্রয়মুল্যের সাথে ব্যবসায়ের পরোক্ষ আনুষঙ্গিক খরচ, যেমন–দোকান ভাড়া, কর্মচারির বেতন, যাতায়াত খরচ ইত্যাদি যোগ করে পণ্যের মোট ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পণ্যের মোট ক্রয় মূল্যের সাথে মুনাফা যোগ করে বিক্রয় মূল্য নিরূপণ করা হয়। যদি একটি ব্যবসায় এক বা একাধিক পণ্য কেনা বেচা করা হয়, তাহলে বিভিন্ন পণ্যের ক্রয় মূল্যের সাথে পরোক্ষ খরচগুলো আনুপাতিক হারে যোগ করে প্রত্যেক পণ্যের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
পণ্যের ক্রয় মূল্য, মোট ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য নিচের তালিকার সাহায্যে দেখানো যায় :

পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত মূল্য +	– – –
প্রত্যক্ষ খরচ	– – –
(পরিবহণ খরচ, কুলি খরচ ইত্যাদি)	– – –
মুখ্য খরচ +	– – –
পরোক্ষ খরচ	
(ঘর ভাড়া, বেতন, টেলিফোন বিল ইত্যাদি)	– – –
মোট ক্রয় মূল্য	
যোগ মুনাফা (মনে কর মোট ক্রয় মূল্যের উপর ২০%	– – –
বিক্রয় মূল্য	– – –

একটি উদাহরণ দেয়া যাক : একজন ব্যবসায়ী প্রতি টিন ১০০ টাকা করে ৫০ টিন গুঁড়া দুধ ক্রয় করল। টিন প্রতি ২ টাকা কুলির মজুরি, ১০ টাকা পরিবহন খরচ এবং ৫ টাকা কর পরিশোধ করল। এ ক্ষেত্রে প্রতি টিন গুঁড়া দুধে প্রত্যক্ষ ক্রয় মূল্য = ১০০+২+১০+৫+=১১৭ টাকা। ৫০টি টিনের প্রত্যক্ষ ক্রয় মূল্য হবে ১১৭ টা X ৫০=৫,৮৫০ টাকা।

ঐ ব্যবসায়ীর দোকান ভাড়া ও কর্মচারির বেতন বাবদ ১,০০০ টাকা ধরা হলে ৫০ টিন গুঁড়া দুধের মোট ক্রয় মূল্য দাঁড়াবে ৫,৮৫০ + ১,০০০ = ৬,৮৫০ টাকা। মোট ক্রয় মূল্যের উপর ২০% মুনাফা ধরলে ৫০ টিন গুঁড়া দুধের বিক্রয় মূল্য হবে ৬,৮৫০+১,৩৭০=৮,২২০ টাকা।

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

গুঁড়া দুধ ক্রয়	
প্রতিটিন ১০০ টাকা হিসাবে ৫০ টিন	৫০০০ টাঃ
+ মজুরি প্রতিটিন ২ টাকা হিসাবে	১০০ টাঃ
+পরিবহন খরচ	
প্রতিটিন ১০ টাকা হিসাবে ৫০ টিন	৫০০ টাঃ
+ কর পরিশোধ	
প্রতিটি ৫ টাকা হিসাবে	২৫০ টাঃ
মুখ্য খরচ/প্রত্যক্ষ খরচ	৫,৮৫০ টাঃ
দোকান ভাড়া ও কর্মচারির বেতন	১,০০০ টাঃ
মোট ক্রয় মূল্য	৬,৮৫০ টাঃ
+মুনাফা (ক্রয়ের ওপর ২০%)	১,৩৭০ টাঃ
বিক্রয় মূল্য	৮,২২০ টাঃ

উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য

যে দ্রব্য কারখানায় তৈরি হয় এবং এতে যে খরচ হয় তাকেই উৎপাদন ব্যয় বলে। যেমন ইট তৈরি কারখানায় ইট তৈরি করতে যে খরচ হয় তাই ইটের উৎপাদন ব্যয়, আসবাবপত্র তৈরি কারখানায় আলমারি তৈরি করতে যে খরচ হয় তাই আলমারির উৎপাদন ব্যয়। উৎপাদন ব্যয়কে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন–কাঁচামালের খরচ, মজুরি খরচ ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ। এগুলোকে উৎপাদন ব্যয়ের উৎপাদান বলা হয়। উৎপাদন ব্যয়কে আবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এ দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রত্যক্ষ ব্যয়কে পুনরায় তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা–(১) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, (২) প্রত্যক্ষ মজুরি, (৩) প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ। একইভাবে পরোক্ষ ব্যয়সমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা–(১) কারখানা ব্যয় (২) অফিসের ব্যয় (৩) বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয়। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি ও প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচের যোগফলকে মুখ্য ব্যয় বলে। মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানার পরোক্ষ খরচের যোগফলকে কারখানার ব্যয় এবং কারখানা ব্যয়ের সাথে অফিস খরচের যোগফলকে উৎপাদন ব্যয় বলে। মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানার পরোক্ষ খরচের যোগফলকে কারখানার ব্যয় এবং কারখানা ব্যয়ের সাথে অফিস খরচের যোগফলকে উৎপাদন ব্যয় বলে। উৎপাদন ব্যয়ের সাথে বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ যোগ করে মোট ব্যয় নির্ণয় করা হয়। মোট ব্যয়ের সাথে লাভ যোগ করে বিক্রয় মূল্য নিরূপণ করা হয়।

উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য নিরূপণের পদ্ধতি নিচে ছকের মাধ্যম দেখানো হল।

প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ক্রয়	– – –
পরিবহণ খরচ	– – –
মজুরি	– – –
মুখ্য ব্যয়+	**– – –**
কারখানার পরোক্ষ ব্যয়	

(কারখানার কর্মচারির বেতন, কারখানার	– –– –
ভাড়া, বিদ্যুৎ খরচ	– –– –
জ্বালানি প্রভৃতি)	– –– –
কারখানা ব্যয় +	**– –– –**
অফিস ও প্রশাসনিক বেতন	– – ––
(অফিসের কর্মচারিদের বেতন,	–––––
অফিসের ভাড়া, মনিহারি খরচ,	–––––
ডাক তার টেলিফোন ইত্যাদি)	–––––
উৎপাদন ব্যয় +	
বিক্রয় কেন্দ্রে উৎপাদিত	
পণ্য পৌছানোর	
পরিবহন খরচ, বিজ্ঞাপন খরচ,	–––––
বিক্রয় কর্মচারিদের বেতন,	–––––
কমিশন ইত্যাদি	–––––
মোট উৎপাদন ব্যয়	–––––
যোগ মুনাফা (মনে কর মোট	
উৎপাদন ব্যয়ের ২৫%)	–––––
বিক্রয় মূল্য	–––––

বিভিন্ন খরচের ব্যাখ্যা

১। **প্রত্যক্ষ কাঁচামাল :** যে কাঁচামাল উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় এবং যা উৎপাদিত পণ্যের সাথে চিহ্নিত করা হয় তাকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বলে, যেমন– কাপড়ের মিলের সুতা, কাঠের ফার্নিচারের জন্য কাঠ, চামড়া কারখানার জন্য চামড়া, ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য ইট, সুরকি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কাঁচামালের উদাহরণ।

২। **প্রত্যক্ষ মজুরি :** সরাসরি উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরিকে প্রত্যক্ষ মজুরি বলে। যেমন–কাঠ মিস্ত্রির মজুরি, দালান নির্মাণে রাজমিস্ত্রির মজুরি, পাটের কলে শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ মজুরির উদাহরণ।

৩। **প্রত্যক্ষ খরচ :** কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ মজুরি ছাড়াও এমন খরচ আছে, যা উৎপাদনের জন্য ব্যয় করা হয় তাকে প্রত্যক্ষ খরচ বলে। যেমন– কাঁচামাল পরিবহন, কর খরচ ইত্যাদি।

৪। **কারখানার খরচ :** প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, মজুরি ও প্রত্যক্ষ খরচ ছাড়াও কারখানার যাবতীয় খরচকে কারখানার পরোক্ষ খরচ বলে। যেমন– কারখানার কর্মচারীর বেতন, কারখানার ভাড়া, বিদ্যুৎ খরচ, মেশিনের মেরামত খরচ, জ্বালানি ব্যয় ইত্যাদি।

৫। **অফিসের ব্যয় :** অফিস পরিচালনা বাবদ যাবতীয় ব্যয়কে অফিস ব্যয় বলে। যেমন– অফিসের কর্মচারিদের বেতন, অফিসের ভাড়া, মনিহারি খরচ, ডাক, তার, টেলিফোন খরচ ইত্যাদি।

৬। **বিক্রয় খরচ :** উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য যে খরচ হয় তাকে বিক্রয় খরচ বলে। যেমন–বিক্রয় কেন্দ্রে নেয়ার জন্য উৎপাদিত পণ্যের পরিবহন খরচ, বিজ্ঞাপনের খরচ, বিক্রয়, কর্মচারিদের বেতন, মাল বিতরণ খরচ ইত্যাদি।

একটি উদাহরণ

একজন আসবাবপত্র ব্যবসায়ীর ২০০টি আলমারি
তৈরি করতে নিম্নোক্ত খরচ হয়

		টাকা
কাঠ খরচ	–	২০,০০০.০০
মিস্ত্রির মজুরি	–	৮,০০০.০০
কাঠ আনার পরিবহণ খরচ	–	১০,০০০.০০
আলমারি তৈরির অন্যান্য খরচ	–	৩,০০০.০০
কারখানার ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ	–	২,০০০.০০
ভ্যাট	–	১,০০০.০০
বিক্রয়ের জন্য আলমারি দোকানে আনার খরচ	–	১,০০০.০০
মনিহারি, ডাক, টেলিফোন	–	১,০০০.০০
অফিস কর্মচারির বেতন	–	৪,০০০.০০
বিক্রয় কর্মীর বেতন	–	১,০০০.০০
দোকান ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ	–	২,০০০.০০

২০০টি আলমারির মুখ্য ব্যয়, উৎপাদন ব্যয় ও মোট ব্যয় বের কর। মোট ব্যয়ের উপর শতকরা ২৫ টাকা লাভে আলমারি বিক্রয় করলে প্রতিটির মূল্য কত?

সমাধান :

২০০ টি আলমারির উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

		টাকা
কাঠ ক্রয়	–	২০,০০০.০০
কাঠ আনার গাড়ি ভাড়া	–	১,০০০.০০
মিস্ত্রির মজুরি	–	৮,০০০.০০
ভ্যাট	–	১,০০০.০০
অন্যান্য সামগ্রী ব্যয়	–	৩,০০০.০০
মুখ্য ব্যয়	–	৩৩,০০০.০০
কারখানার ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ	–	২,০০০.০০

	টাকা	টাকা
কারখানা ব্যয়	–	৩৫,০০০.০০
অফিস কর্মচারির বেতন	৪,০০০.০০	–
মনিহারি, ডাক ও টেলিফোন	১,০০০.০০	–
		৫,০০০.০০
মোট উৎপাদন ব্যয়		৪০,০০০.০০
দোকানে আলমারি আনার ভাড়া	১,০০০.০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন	১,০০০.০০	
দোকান ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ	২,০০০.০০	
	....	৪,০০০.০০
মোট ব্যয়		৪৪,০০০.০০
যোগ ২৫% মুনাফা : মোট ব্যয়ের উপর		১১,০০০.০০
বিক্রয় মূল্য		৫৫,০০০.০০

প্রতিটি আলমারির তৈরি খরচ : ৪৪,০০০.০০ ÷ ২০০=২২০ টাকা
প্রতিটি আলমারির বিক্রয় মূল্য : ৫৫,০০০.০০ ÷ ২০০=২৭৫ টাকা

অনুশীলন

বিষয় : খাম উৎপাদন খেলা

উদ্দেশ্য

এ খেলা শেষে শিক্ষার্থীরা একটি প্রকল্পের সংগঠন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবে।

সময় : ২$\frac{১}{২}$ – ৩ ঘণ্টা।

উপকরণ :

১। ছোট খাম–১ ডজন (এর মধ্যে ৬টি খাম পানি দিয়ে ভিজিয়ে সম্পূর্ণভাবে খুলে নিতে হবে)
২। ডুপ্লিকেটিং পেপার– প্রয়োজনমত
৩। কাঁচি
৪। আঠা বা আইকা
৫। স্কেল
৬। পেন্সিল
৭। ছুরি
৮। আর্ট পেপার (মোটা)
৯। চেয়ার, টেবিল (পরিমাণমত)
১০। বোর্ড, চক
১১। চুক্তিপত্র ও মূল্য তালিকা
১২। ঝুঁড়ি

অনুশীলনের ধাপসমূহ

১ম ধাপ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কিছু খাম উৎপাদন করে সরবরাহ করবে। এ কাজ পরিকল্পনা করার জন্য সময় দেয়া হবে ১৫ মিনিট। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ঘরভাড়া ও কাঁচামালের দাম নিম্নলিখিত হারে নগদ টাকায় পরিশোধ করবেন এবং এ সময়ের মধ্যে কয়টি খাম সরবরাহ করতে পারবে তা চুক্তিপত্র করে নেবে। চুক্তি ও নমুনা অনুযায়ী সরবরাহ করতে পারলে একটি খামের জন্য ২ টাকা হারে পাবে। সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে প্রতিটি খামের জন্য .৫০ টাকা হারে নগদ টাকায় জরিমানা পরিশোধ করতে হবে।

অর্ডার ফরম

যন্ত্রপাতি ভাড়া

সংখ্যা	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য / টাকা	মোট মূল্য / টাকা
১।	আঠা		২.০০	
২।	ডাইস (টেম্পলেট)		২.০০	
৩।	টেবিল		২.০০	
৪।	চেয়ার		২.০০	
৫।	কাঁচি		২.০০	
৬।	স্ট্যাপলার		২.০০	
৭।	স্কেল		১.০০	
৮।	রুমের ভাড়া		১.০০	
৯।	বিদ্যুৎ		১.০০	
১০।	পেন্সিল/রবার		১.০০	
১১।	আর্ট পেপার		১.০০	
১২।	কাঁচামাল (প্রতি দশ পিস কাগজ)		১.০০	
	মোট			

দলনেতার স্বাক্ষর

পণ্য সরবরাহের চুক্তিপত্র

আমরা এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আপনাদের প্রেরিত নমুনা মোতাবেক (আপনার অনুমোদন সাপেক্ষে) সমমানের .... টি খাম নির্ধারিত ৪০ মিনিটের মধ্যে সরবরাহ করব।

বাতিলকৃত ও অসরবরাহকৃত পণ্যের জন্য জরিমানা দিতে আমরা বাধ্য থাকব।

স্বাক্ষর

....

(কোম্পানির প্রতিনিধি)

কোম্পানির নাম ....

স্বাক্ষর ....

(ক্রেতা)

২য় ধাপ :
শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হবে এবং প্রতি দল একজন ব্যবস্থাপক/পরিচালক নির্বাচন করবে।

৩য় ধাপ :
প্রত্যেক দল ১৫ মিনিট ধরে পরিকল্পনা করবে। পরিকল্পনার সময় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষার্থীরা কাজ করবে। নির্ধারিত সময়ে (৪০ মি.) কতগুলো খাম উৎপাদন করে সরবরাহ করবে।

– উৎপাদনের জন্য কী কী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল লাগবে। (ঘর ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিল সবার জন্য থাকবে)।
– উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচের টাকা সবাই সমানভাবে ভাগ করে ব্যবস্থাপক/পরিচালকের হাতে দেবে।
– ব্যবস্থাপক/পরিচালক মূল্য তালিকা পূরণ করে চুক্তিপত্রে সই করবে।
– পরিকল্পনার সময় যদি কোনো দলের কোনো কিছুর (নমুনা যন্ত্রপাতি কাঁচামাল ইত্যাদি) দরকার হয় তাহলে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপক পরিচালক/শিক্ষকের কাছ থেকে গোপনে নিতে পারবে।

৪র্থ ধাপ :
মূল্য তালিকা ও চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্রতি দল শিক্ষকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মালামাল বুঝে নিয়ে দাম পরিশোধ করবে।

৫ম ধাপ :
প্রতিটি দল খাম উৎপাদন করবে। উৎপাদন শেষে উৎপাদিত খাম ও যন্ত্রপাতি শিক্ষককে বুঝিয়ে দেবে।

৬ষ্ঠ ধাপ :
উৎপাদিত খামের মান নিয়ন্ত্রণের পর যদি দেখা যায় যে, কোনো দল লাভ করতে পারেনি তবে আবার সব দলই খাম বানানোর সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও উৎপাদনের সময় কম পাবে। দ্বিতীয় বার উৎপাদনের সময় যন্ত্রপাতির কোনো ভাড়া দিতে হবে না। তবে শুধু কাঁচামালের দাম ও ঘরভাড়া এবং বিদ্যুৎ খরচ দিতে হবে।

শিক্ষকের করণীয়

পরিকল্পনার সময় প্রত্যেক দলের প্রত্যেকের ভূমিকা যেমন– আলোচনায় অংশগ্রহণ, নমুনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, পরীক্ষামূলক উৎপাদন, ৪০ মিনিটে কতগুলো খাম বানানো যায়, নির্ধারিত সময়ের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং নোট রাখবেন।

উৎপাদনের সময় দেখবেন যে–

– মান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে কি না

– পরিচালক কাজের তত্ত্বাবধান করছেন কি না

– পরিচালক সকলের কাছ থেকে কাজ বুঝে নিচ্ছেন কি না

– প্রয়োজনীয় উপকরণাদি বিতরণের পর নিম্নলিখিত ছকটি বোর্ডে আঁকবেন এবং পর্যায়ক্রমে তা পূরণ করবেন।

দলের নাম	অর্ডারকৃত মাল	সরবরাহকৃত মাল	ক্রয়কৃত পণ্য	জরিমাণা	উৎপাদন খরচ	বিক্রয় মূল্য	লাভ	লোকসান

– উৎপাদনের পর একে একে প্রত্যেক দলের সরবরাহকৃত খাম প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী হল কি না তা যাচাইয়ের মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রণ করবেন।

– সরবরাহকৃত খাম কতগুলো গ্রহণ করা হল, কতগুলো খাম সরবরাহ হয়নি তার ভিত্তিতে উল্লিখিত ছক পূরণ করে লাভ–লোকসানের হিসাব বের করবেন।

– যে দল সবচেয়ে বেশি লোকসান/কম লাভ করেছে সে দলের কাছ থেকে লোকসানের কারণ জেনে নিয়ে বোর্ডে লিখবেন।

– যে দল সবচেয়ে বেশি লাভ করেছে সে দলের লাভ করার কারণ জেনে বোর্ডে লিখবেন।

– অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সহায়তায় প্রাপ্ত তথ্যের বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. মোট ক্রয়মূল্যের সাথে ব্যবসায়ের মুনাফা যোগ দিলে পাওয়া যায় ?

ক. প্রত্যক্ষ ক্রয় মূল্য　　খ. পরোক্ষ ক্রয় মূল্য

গ. মোট ক্রয় মূল্য　　ঘ. মোট বিক্রয় মূল্য

২. কীভাবে মুনাফা বৃদ্ধি করা যায় ?

i. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে

ii. বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে

iii. উৎপাদন বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

সখিপুর গ্রামের মানিক মিয়ার ২০০টি পণ্য দ্রব্য উৎপাদনের খরচের ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ :

কাঁচামাল ক্রয়	১২,০০০/–
শ্রমিকের মজুরি	৮,০০০/–
কারখানার ভাড়া	৬,০০০/–
অফিস খরচ	৫,০০০/–
বিক্রয় খরচ	৪,০০০/–

৩. **কাঁচামালের ব্যয় কোন খরচের অন্তর্ভুক্ত ?**

ক. প্রত্যক্ষ খরচ খ. পরোক্ষ খরচ
গ. কারখানার খরচ ঘ. বিক্রয় খরচ

৪. **মানিক মিয়ার ২০০টি উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে –**

ক. ৯,০০০ টাকা খ. ১৪,০০০ টাকা
গ. ২০,০০০ টাকা ঘ. ৩৫,০০০ টাকা।

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সখিপুর গ্রামের মানিক মিয়া একজন ব্যবসায়ী। তিনি উৎপাদন শুরুর আগেই তার উৎপাদিত পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং উৎপাদন ব্যয় নিরূপণের কাজটি সম্পন্ন করেন। তিনি পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে পাইকারি বিক্রয় করেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে তার কারখানায় ২০০টি দ্রব্য উৎপাদন করেন।

যার ব্যয় নিম্নরূপ :

কাঁচামাল ক্রয়	–	১২,০০০ টাকা,
প্রত্যক্ষ মজুরি	–	৮,০০০ টাকা,
কারখানার পরোক্ষ ব্যয়	–	৩০,০০০ টাকা,
অফিস খরচ	–	২০,০০০ টাকা,
বিক্রয় খরচ	–	২০,০০০ টাকা।

ক. খরচ কত প্রকার ?

খ. অনুচ্ছেদটিতে বর্ণিত যে কোনো একটি ব্যয় ব্যাখ্যা কর।

গ. মানিক মিয়ার ২০০টি দ্রব্য তৈরির একটি ব্যয় বিবরণী তৈরি কর এবং ২০% লাভে বিক্রয় মূল্য বের কর।

ঘ. "উৎপাদন ও ব্যবসায় শুরু করার আগেই পণ্যের ক্রয় মূল্য ও উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ আবশ্যক"–উক্তিটি কতটুকু যথাযথ তা ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায় ১০

ব্যবসায় শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

অধ্যায় সূচি

১. সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
২. পরিদর্শনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
৩. প্রতিবেদন
৪. প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু
৫. নির্ঘণ্ট
৬. গ্রন্থ বিবরণী,
৭. পরিদর্শনের উদ্দেশ্য

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান লাভের পর সরেজমিনে প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি, আকৃতি, অবস্থা, উৎপাদন ও সেবা সম্পর্কে ধারণা লাভের প্রক্রিয়াকে পরিদর্শন বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে হলে সশরীরে সেখানে উপস্থিত হওয়া উচিত। হাজির হওয়ার পর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারিদের সাথে প্রত্যক্ষ আলাপ–আলোচনায় অনেক প্রকৃত তথ্য জানা সম্ভব হয়। এ ছাড়া নিজের চোখে অনেক কিছু দেখেও জ্ঞান আহরণ করা যায়।
কাজেই এ কথা বলা যায় যে, ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শিক্ষার পূর্ণতা আনয়নে সহায়তা করে। পরিদর্শন সুশৃঙ্খলভাবে ও পর্যায়ক্রমে হওয়া উচিত। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত লিখে নেয়া উচিত, যাতে প্রতিবেদন প্রণয়নে কোনো অসুবিধা না হয়।

পরিদর্শনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ছাত্র–ছাত্রীদের আবার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে গিয়ে প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন কী? তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভের সাথে সাথে প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করলে তাতে তাদের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উভয় জ্ঞানের সমন্বয়েই শিখন সার্থক হয়। কাজেই সেদিক থেকে ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের গুরুত্ব রয়েছে। নিম্নে কতিপয় পয়েন্টে পরিদর্শনের গুরুত্ব উল্লেখ করা হল :

১. প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত হওয়া যায়
২. এর অবস্থান ও পরিবেশ সম্পর্কে জানা যায়
৩. এর কাজের প্রকৃতি ও পদ্ধতি অবহিত হওয়া যায়
৪. মালিক ও কর্মচারিদের মনোভাব জানা যায়
৫. তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়
৬. তারা কীভাবে এগুলোর সমাধান করছে তা জানা যায়
৭. ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়
৮. নিজে ভবিষ্যতে এ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে
৯. আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় ইত্যাদি

প্রতিবেদন

ব্যবসায় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শনের পর অর্জিত জ্ঞানের আলোকে একটি প্রতিবেদন বা রিপোর্ট তৈরি করতে হয়। প্রতিবেদনটির একাধিক কপি তৈরি করতে হয়। কারণ শিক্ষকও প্রতিষ্ঠানকে ১ (এক) কপি করে জমা দেয়ার পর নিজের কাছেও এক কপি রাখা প্রয়োজন। পরিদর্শনের পরে সংগৃহীত উপাত্ত ও তথ্য এবং অর্জিত জ্ঞান একত্রিত করে লিখিতভাবে যে বিবরণী দাখিল করা হয় তাকে প্রতিবেদন বলে।

প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু

প্রতিবেদন লেখার সময় এর বিষয়বস্তুর দিকে খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, বিষয়বস্তুর ওপর প্রতিবেদন প্রণয়নের সার্থকতা নির্ভর করে। বিষয়বস্তু ধারাবাহিক ও স্পষ্ট হওয়া উচিত। প্রতিবেদনের সূচি বা বিষয়বস্তু পরিদর্শনের উদ্দেশ্যের উপরেও নির্ভর করে। কাজেই পরিদর্শন আরম্ভ করার সময়েই এ ব্যাপারে চিন্তা করা প্রয়োজন হয়। পরিদর্শনের পূর্বেই লিখিত আকারে পরিদর্শনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা উচিত। এর ফলে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ফলপ্রসূ হয়। বিষয়বস্তুকে প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করে নিতে হয়। প্রতিবেদনের মধ্যে প্রধানত যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ থাকে তা নিম্নরূপ:

১. ভূমিকা

এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন:

ক. পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব
খ. প্রতিষ্ঠানের বিবরণ (প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যসহ)
গ. জাতীয় অর্থনীতিতে ও সমাজে এর অবদান বা ভূমিকা ইত্যাদি

২. পরিদর্শন পদ্ধতি

ক. পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ও আওতা
খ. তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
গ. এগুলো শ্রেণীবদ্ধকরণ ও উপস্থাপন
ঘ. পরিদর্শনকালীন সমস্যা

৩. তথ্য বিশ্লেষণ

এ অধ্যায়ে পরিদর্শনের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ও সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের উপস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন– ধরা যাক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। এর আলোকে নিচের বিষয়গুলো এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হতে পারে।

ক. কী কী পণ্য উৎপাদিত হয়
খ. কোন বছর কী পরিমাণ উৎপাদিত হয়েছে
গ. পণ্যের কাঁচামাল কোথা হতে সংগৃহত হয়েছে
ঘ. কীভাবে পণ্য উৎপাদিত হয়েছে
ঙ. কীভাবে পণ্য বাজারজাত করা হয়
চ. উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে কী কী সমস্যা হয় ইত্যাদি

৪. উপসংহার ও সুপারিশমালা

এ অধ্যায়ে পরিদর্শনকালে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া, যেসব সমস্যা দেখা গেছে সেগুলো সমাধানের সম্ভাব্য উপায় কী হতে পারে পরিদর্শক তাও সুপারিশের আকারে পেশ করে থাকেন।

নির্ঘণ্ট

প্রতিবেদনের এ অংশে উপাত্তের সারনি ও চিত্র উপস্থাপন করা হয়। এর দুটি পদ্ধতি আছে। যথা :

ক. প্রতিবেদনের প্রতিটি অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট আলোচনার সাথে উপস্থাপন এবং
খ. প্রতিবেদনের শেষে পৃথকভাবে ক্রমিক নম্বরসহ উপস্থাপন

উভয় পদ্ধতিই স্বীকৃত। তবে শেষ বা প্রথমে যেখানেই উপস্থাপন করা হোক না কেন সংশ্লিষ্ট স্থানে এর রেফারেন্স থাকতে হবে।

গ্রন্থ বিবরণী

পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে যেসব বইপুস্তক, সাময়িকী, গবেষণা গ্রন্থ, রিপোর্ট, জার্নাল, সরকারি প্রকাশনা, বার্ষিক বিবরণী ইত্যাদির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে তার বর্ণনা এ অংশে দেয়া হয়। গ্রন্থ বিবরণী প্রতিবেদনের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য

সাধারণ উদ্দেশ্য

ছাত্র–ছাত্রীদের সাথে নিয়ে ব্যবসায়/শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কর্মসূচির সাধারণ উদ্দেশ্য হল ছাত্র–ছাত্রীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়/শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সম্যক ও বাস্তব ধারণা প্রদান করা। এতে ব্যবসায়/শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ও কার্যাবলি সম্পর্কে তারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১। ছাত্র–ছাত্রীদেরকে একটি ব্যবসায় বা শিল্পের পরিবেশ সচক্ষে দেখার ও কর্মকাণ্ড লক্ষ করার সুযোগ দান।

২। যারা ব্যবসায়কে জীবিকা অর্জনের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের সাথে ছাত্র–ছাত্রীর পরিচিত হওয়ার সুযোগ দান।

৩। ক্ষুদ্র ব্যবসায়/শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় ও শিল্পোদ্যোগীয় ভূমিকা কী সে সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করার সুযোগ দান।

৪। ছাত্র–ছাত্রীদেরকে আত্মবিশ্বাসী, স্বাবলম্বী, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী হওয়ার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সময় : একদিন।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

ব্যবসায়/শিল্প ইউনিট পরিদর্শন ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ।

ট্রেনিং সহায়ক

সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষকের পরিদর্শনের জন্য নিকটবর্তী বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় ও শিল্প ইউনিট নির্বাচন করা উচিত। সে ইউনিট আত্মকর্মসংস্থানমূলক বা শিল্প ইউনিট হতে পারে।

করণীয়

ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পূর্বে ছাত্র–শিক্ষকের নিম্নলিখিত কার্যপন্থাসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

– পরিদর্শনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মালিক বা ম্যানেজারের অনুমতি নিতে হবে।

– ছাত্র/ছাত্রীদের ৪টি গ্রুপে ভাগ করে প্রত্যেক গ্রুপকে নিচে বর্ণিত যে কোন একটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন লিখতে বলতে হবে। অবশ্য ছাত্রসংখ্যা কম হলে প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে নিচের বিষয়গুলোর উপর তথ্য সংগ্রহ করতে বলা যেতে পারে।

১। শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলি

২। উৎপাদন ও প্রশাসন সংক্রান্ত তথ্য

৩। বাজার সংক্রান্ত তথ্য

৪। প্রকল্প ব্যয়

৫। স্থায়ী পুঁজি, চলতি পুঁজি এবং অর্থসংস্থান সম্পর্কিত তথ্য

শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে থাকবেন এবং প্রয়োজনবোধে সাহায্য করবেন কিন্তু পরিদর্শন ও আলোচনার মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীরাই তথ্য সংগ্রহ করবে। পরিদর্শনের ১ দিন পর ছাত্র/ছাত্রীরা রিপোর্ট উপস্থাপন করবে। শিক্ষক প্রতিবেদনের উপর মন্তব্য রাখবেন এবং ছাত্র/ছাত্রীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য নিচে বর্ণিত প্রশ্নগুলো বিবেচনা করা দরকার।

১। ব্যবসায়টি কী সাফল্য অর্জন করেছে? যদি তাই হয় তাহলে সাফল্যের কারণ কী?

২। শিল্পোদ্যোক্তা ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তা কীভাবে মোকাবিলা করা হয়েছিল।
৩। ব্যবসায় ব্যবহৃত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলো কী কী? এগুলো কতটুকু কার্যকর?
৪। শিল্পোদ্যোক্তার কোন কোন গুণাবলি সাধারণ গুণাবলির আওতায় পড়ে?
৫। বাজার পরিবেশ কি সন্তোষজনক?
৬। পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কী? যদি থাকে তবে তা দূর করার উপায় কী?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রতিবেদনের মধ্যে মূলত কোনটি থাকা উচিত?

ক. উদ্দেশ্য খ. নিজস্ব ধারণা
গ. সংজ্ঞা ঘ. পরিদর্শকের ব্যক্তিগত গুণাবলি

২. ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হল –

i. ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বাস্তব ধারণা লাভ
iii. ব্যবসায় যাদের পেশা তাদের সাথে পরিচিতি হওয়ার সুযোগ লাভ
iii. ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

জনাব কামাল চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক। তিনি ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক থেকে ব্যবসায় সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে তাত্ত্বিক শিক্ষা প্রদান করেন। বাস্তবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি, আকৃতি, অবস্থা, উৎপাদন ও সেবা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ছাত্রদের নিয়ে তিনি একটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

৩. পরিদর্শনের মাধ্যমে কী অর্জন করা যায় ?

ক. বাস্তব ধারণা খ. কর্মসংস্থান
গ. মালিকের সাথে সম্পর্ক ঘ. মালিকের সমর্থন

৪. শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করলে ছাত্রদের কী লাভ হয় ?

ক. আত্মসচেতনতা বাড়ে খ. সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারে
গ. নিয়ম-শৃঙ্খলা বাড়ে ঘ. প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব রহিম কুমিল্লা জিলা স্কুলের ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক। তিনি ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক থেকে ব্যবসায় সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে তাত্ত্বিক শিক্ষা প্রদান করেন। বাস্তবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি, পদ্ধতি, অবস্থান, উৎপাদন ও সেবা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ছাত্রদের নিয়ে তিনি একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

ক. পরিদর্শন কাকে বলে ?
খ. পরিদর্শনের ২টি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
গ. 'পরিদর্শন হল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ' —এর আলোকে পরিদর্শনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
ঘ. পরিদর্শনের পূর্বের পদক্ষেপগুলো কী হতে পারে বলে তোমার ধারণা ? এ সম্পর্কে মতামত দাও।

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জী

১।	শিল্পোদ্যোগ পরিচিতি	এ, এইচ, এম, হাবিবুর রহমান ও অন্যান্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ১৯৮৯
২।	শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন	এ, এইচ, এম, হাবিবুর রহমান ও অন্যান্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ১৯৮৯
৩।	উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল	সামসুন নাহার ও অন্যান্য, ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্প, ফরিদপুর, ১৯৯২
৪।	আপনার ব্যবসায় কীভাবে শুরু করবেন	খাজা মঈনউদ্দিন, আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প, বি, জি, ডি/১৫১/৮৫, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ঢাকা
৫।	হিসাব রক্ষণ	মোঃ মাহফুজুর রহমান, রচিত ও সম্পাদিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তব বোর্ড, ১৯৯৪, ঢাকা
৬।	উচ্চ–মাধ্যমিক হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিজ্ঞান	কাজী ফারুকী ও অন্যান্য দ্বারা সম্পাদিত কাজী প্রকাশনী ও সৈকত প্রকাশনী ঢাকা, চট্টগ্রাম–১৯৯২
৭।	Starting and Managing Small Business	Kuriloft Arther H. & Others McGraw Hill Book Coppany, 1983
৮।	আধুনিক অর্থশাস্ত্র	আনিসুর রহমান, মার্চ, ১৯৮৭
৯।	শিল্প উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা	ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, জানুয়ারি, ১৯৮৭
১০।	শ্রম ও শিল্প আইন	অধ্যাপক এ, এ, খান, ১৯৮৮
১১।	কারবার সংগঠন	ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, নভেম্বর, ১৯৮৬
১২।	বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন	এম, এইচ, আলী, জানুয়ারি, ১৯৮৫
১৩।	অর্থ রোজগারের প্রচেষ্টা (আয়মূলক প্রকল্পের ইতিবৃত্ত)	ইকবাল মাহমুদ (প্যাক্ট এর আর্থিক সহায়তায় ১৯৯২ সালে মুদ্রিত)
১৪।	Women Entrepreneurship in Bangladesh	Nilufer Ahmed karim ILO/BSCIC, Dhaka.

লেখক পরিচিতি

এ, এইচ, এম, হাবিবুর রহমান ১৯৩৯ সালের ৩০শে অক্টোবর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বি. কম. (অনার্স) ও এম. কম. পাস করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৬৯ সালে তিনি ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইল্যান্ড থেকে শিল্প–অর্থায়ন বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ড. রহমান ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন বাণিজ্য বিভাগে রিডার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে তিনি ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। অধ্যাপক রহমান শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে শিল্পোদ্যাগ কোর্স প্রচলন এবং পাঠ্যক্রম উন্নয়নে অগ্রণি ভূমিকা পালন করে আসছেন। শিল্পোদ্যোগ বিষয়ের উপর তাঁর অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বি. কম (অনার্স) ও এম. কম. শ্রেণীর জন্য লিখিত পাঠ্যপুস্তকের একজন লেখক ও প্রধান সম্পাদক। তিনি দেশে বেশ কয়েকটি শিল্পোদ্যোগ প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়ন ও পরিচালনা করেছেন। ড. রহমান শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করেন।

নিলুফার আহমেদ করিম ১৯৫৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। হলিক্রস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে আই. এ. পাস করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি. এ. অনার্স ও এম. এ. পাস করেন। ১৯৮১ সালে তিনি গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি সেখানে ম্যানেজমেন্ট কাউন্সেলর হিসেবে কর্মরত আছেন। নিলুফার করিম Project Feasibility, Project Management, Business Management, Management Conultancy, Training of Trainers for Entrepreneurship Development বিষয়ে দেশে ও বিদেশে (জাপান, আমেরিকা, ফিলিপাইন, ভারত) উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি আই এল ও, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউনিসেফসহ বহু দেশি ও বিদেশি সংস্থা এবং এনজিওতে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। বাংলাদেশের উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিশেষ করে মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়নে তিনি অগ্রণি ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। তিনি বাংলাদেশ উইমেন এন্ট্রিপ্রিনিউয়ার্স এসোসিয়েমন (উইএ) এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদিকা।

–: সমাপ্ত : –

২০১০
শিক্ষাবর্ষ

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সৎ পরামর্শের চেয়ে কোনো উপহার
অধিক মূল্যবান নয়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা বাংলাদেশ

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য